জননী জন্মভূমিশ্চ

জননী জন্মভূমিশ্চ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগনেট প্রেস · কলিকাতা ২০

দ্বিতীয় সিগ্‌নেট সংস্করণ : কাতিক ১৩৫৪

প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগ্‌নেট প্রেস

১০।২ এল্‌গিন রোড : কলিকাতা

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন : শিবরাম দাস

মুদ্রাকর : শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রভু প্রেস : ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রিট

প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন : গসেন এণ্ড কোং

বাঁধিয়েছেন : বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম আড়াই টাকা

এক
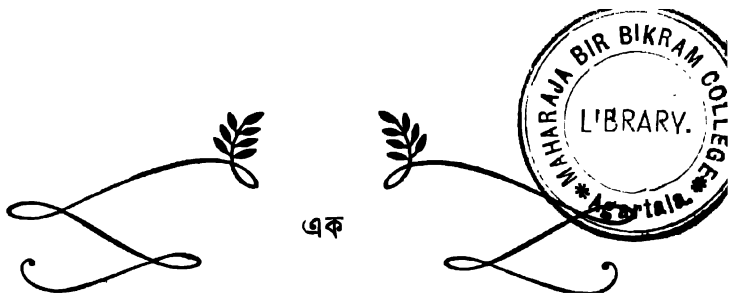
রাজলক্ষ্মী দ্বিতীয় পক্ষে পড়িয়াছিল, কিন্তু বিবাহের বছর বারো পরেই স্বামী যখন হঠাৎ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিবার উপক্রম করিলেন, লোকলজ্জার মাথা খাইয়া সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল : নাবালক ছেলেছুটোর কী ব্যবস্থা করে গেলে? রাজলক্ষ্মীর সপত্নী-পুত্র কালিকিঙ্কর তাহার সমবয়সী, বাপের মৃত্যুর পর সংসারে তাহারই বিস্তৃত একাধিপত্য চলিবে—অগত্যা তাহারই প্রতি আঙুল তুলিয়া ইশারা করিয়া রাজলক্ষ্মীর স্বামী ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে রাজলক্ষ্মীর মন উঠিল না। স্বামীকে লইয়া ডাক্তার-কবিরাজ আত্মীয়-পরিজন যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, আস্তে-আস্তে পাশের ঘরে গিয়া সে মোটা চাবি ঘুরাইয়া লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিল! চাবিটা এখনো পর্যন্ত কর্তার জিম্মায় ক্যাশবাক্সের মধ্যে বন্ধ হইয়া আছে, কিন্তু তাঁহার এই রাত্রি পোহাইতে-না-পোহাতেই সেটা কালিকিঙ্করের হস্তগত হইবে। রাশীভূত আঁচলে কড়াটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাজলক্ষ্মী ডালাটা টানিয়া

তুলিল। ওদিকে পাশের ঘরে বহুকণ্ঠে নানারূপ অসংলগ্ন কোলাহল হইতেছে—তাহাতে কান দিবার এখন সময় নাই। দুই ক্ষিপ্র, ত্রস্ত, অসহিষ্ণু হাতে রাজলক্ষ্মী সিন্দুকটা ঘাঁটিতে বসিল, কতগুলি কাগজ-পত্রের বাণ্ডিল ছাড়া কিছুই তাহার হাতে ঠেকিল না। তাহার গয়নার ঝাঁপিটা এক কোণে পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু বৃহৎকায় থলেগুলির স্ফীতি অনুভব করিতে গিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সবগুলি শূন্য, অন্তঃসারহীন। ওদিকে রাশি-রাশি অসংলগ্ন কোলাহল সমবেত আর্তনাদে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে রাজলক্ষ্মী বিশেষ বিচলিত হইতেছে না; তাহা তো সে জানেই—যেদিন তাহাকে তাহার বয়সের তুলনায় এই বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই তো সে ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—কিন্তু সর্বনাশ যে শেষকালে এমন মূর্তিতে দেখা দিবে তাহা সে কোনো দিন ভাবিয়া দেখে নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর সপত্নী-পুত্রের সংসারে রাজলক্ষ্মী বেশি দিন টিকিতে পারিল না। স্বভাবতই সে রুক্ষস্বভাব, কলহপ্রিয় ও ও কটুভাষী—তাহার পর স্বামীর সংসারে তাহার সিংহাসন তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছেই, উপরন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নাবালক দুইটি ছেলে লইয়া কালিকিঙ্করের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। স্বামী যদি হঠাৎ এমনি সন্ন্যাসরোগে মারা না যাইতেন, রাজলক্ষ্মীকে তাহা হইলে এমন শূন্য হাতে কপাল

কুটিতে হইত না। কিছু সে অনায়াসে গুছাইয়া নিতে পারিত। এই সুযোগে কালিকিঙ্করের স্ত্রী ষোড়শী সংসারের সমস্ত ব্যাপারে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করিবার জন্য কোমরে কাপড় বাঁধিয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেছে। সেই নম্রচক্ষু, মৌনমুখী মেয়েটিকে এখন আর চিনিবার জো নাই। তাহার গলা এখন সবার উপরে; তাহার দৃপ্ত, দ্রুত পদশব্দে সমস্ত সংসার টলমল করিয়া উঠিল। ভাঁড়ার হইতে রান্নাঘর, গোয়ালঘর হইতে মুদির দোকান—সমস্ত এখন তাহারই এলাকায়। কোন বেলা কী রান্না হইবে, কোন মাছখানা কাহার পাতে পড়িবে, বছরে কাহার কয়খানা কাপড় লাগিবে তাহার ব্রত-সমাপ্তির দিন পাড়ার কাহাকে-কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে ইত্যাদি তুচ্ছ ও বৃহৎ যাবতীয় ব্যাপারে ষোড়শীরই এখন অপ্রতিহত প্রভাব। কালিকিঙ্করের সমস্ত পরামর্শ তাহার সঙ্গে: ক্যাশবাক্সের চাবির গোছা এখন তাহার আঁচলেই উঠিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা চক্ষু মেলিয়া রাজলক্ষ্মী সহ্য করিতে পারিল না। একজনের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার এই জীবন্ত সহমরণের জ্বালা তাহার কাছে ক্রমশ দুর্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু নির্বিবাদে সহ্য করিবার মেয়ে সে নয়।

উঠিতে-বসিতে ষোড়শীর সঙ্গে ঝগড়া তাহার লাগিয়াই আছে। এবং যত নগণ্য কারণেই হোক না কেন, সে-সব ঝগড়ায় সমারোহের এতোটুকু ত্রুটি ঘটেনা। ধোপা-বাড়িতে কাপড় দিবার সময় ষোড়শী সমস্ত কাপড়-জামার পরিচ্ছন্নতা-অপরিচ্ছন্নতার

তারতম্য বিচার করিতে বসে ; তেমনি একদিন রঙ্গলালের একটা শার্ট তুলিয়া লইয়া সে কহিল : এটা তো দিব্যি ফরশা আছে, আরো একছুট গায়ে দেয়া চলে ! এইটুকু ছেলে—তারই যাচ্ছে কি না সাতখানা !

রাজলক্ষ্মী তাড়িয়া আসে : কেন যাবে না শুনি ? তোমার নতুন ভাইটিকে যে এনে বসিয়েছ তার গেছে ক'খানা ?

ষোড়শী মুখ ঘুরাইয়া বলে : আহা, কার সঙ্গে কার তুলনা ! আমার ভাই থার্ড ক্লাশে পড়ে, দস্তুরমতো তার গোঁফের রেখা দিয়েছে— তার কাছে কিনা ও ! এটুকু বাচ্চা ছেলে—এতো বাবুগিরি কিসের ? ফরশা জামা-কাপড় ছেলের গায়ে না উঠলে যদি জাত যায়, তবে নিজ হাতে কেচে নিলেই তো পারেন।

রাজলক্ষ্মী মারমুখো হইয়া উঠে : কেন কাচতে যাবো ? তোমার বাপের পয়সায় ধোপা-বাড়িতে কাপড় যাচ্ছে ?

ষোড়শী রঙ্গলালের শার্টটা বারান্দায় ছুড়িয়া দিয়া বলে : কার পয়সায় যাচ্ছে তা আর ঠাট করে বলতে হবে না। যাই হোক, আমি যখন বলছি, ও-জামা যেতে পারবে না। দাদার ঘাড়ে চেপে ঐটুকু ছেলের এমন বেজাতীয় বাবুগিরি চলবে না এখানে।

—দাদার ঘাড়ে ! রাজলক্ষ্মী চোয়াল বাঁকাইয়া রুখিয়া উঠে : কালিকিঙ্করের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে এমন কথা বলতে পারে শুনি ? দাদার পয়সা ? বিষয়-আসয়ে ওদের সমান-সমান ভাগ নেই ভেবেছ ? ওরা অমনি ভেসে এসেছে ? মোক্তারি করে তোমার

সোয়ামি ক'পয়সা ঘরে এনেছে জিগগেস করি ? দাদার পয়সা ! বলতে জিভটা খসে পড়লো না ?
ষোড়শী গম্ভীর হইয়া বলে : অতো শাসাচ্ছেন কী ! ভাগ আছে তো আদালতে গিয়ে মামলা করুন না। এখানে তবে পড়ে আছেন কী করতে ?
—এ কী তোমার বাপের জায়গায় পড়ে আছি ? এ আমার সোয়ামির ভিটে, এখানে আমার ষোলআনা কায়েমি স্বত্ব—এত-টুকু অপমান সইবো না, বড়-বৌ। শিগগির ঐ শার্ট তুমি কুড়িয়ে এনে বোঁচকার সঙ্গে বেঁধে রাখো, নইলে ভালো হবে না বলছি।
—কী অতো চোখ করছেন ? রাখবো না তো কী করতে পারেন করুন না।—ষোড়শীও তাড়াতাড়ি আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া নেয়। সেই মুহূর্তে কী যে ঠিক করা যায় রাজলক্ষ্মী এক নিমেষে ভাবিয়া পায় না। অগত্যা মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে প্রবলকণ্ঠে ডাক পাড়িতে থাকে।

রঙ্গলাল এই বছর ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে প্রমোশন পাইয়াছে, পান্নালাল সবে ইস্কুলে ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেছিল। পরদিন রঙ্গলাল আসিয়া মাকে বলিল : আজ আমাদের মাইনে দিতে হবে।
রাজলক্ষ্মী বলিল : দাদার ঠেঁয়ে চেয়ে নে গে, যা।
কথাটা সে পাড়িতেই কালিকিঙ্কর সরাসরি বলিয়া বসিল :

টাকা-পয়সা সব আকাশ ফুঁড়ে আসে, না ? যা, আজ হবে না।
নিতান্ত ভীত হইয়া রঙ্গলাল বলিল : আজ না দিলে কাল থেকে একআনা করে জরিমানা লাগবে।

—জরিমানা লাগবে! ষোড়শী ভেঙচাইয়া উঠিল : অমন ইস্কুলে তবে ঠাট করে পড়া কেন ? ইস্কুল থেকে ছোঁড়ার নাম কাটিয়ে দাও।

দুঃখে, অভিমানে রঙ্গলালের চোখে জল আসিয়া পড়িল ; কহিল : মোটে আড়াইটে তো টাকা!

তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিয়া ষোড়শী কহিল : যতো বড়ো মুখ নয়, ততো বড়ো কথা! আড়াই টাকার হিসেব নিতে এসেছেন! যা না তোর মা'র কাছে, সে দিতে পারে না ? সিন্দুকের সব মোহরগুলোই তো আলগোছে সরিয়ে ফেলেছে— নগদ টাকা কিছুই তো আর পাওয়া গেলো না। বসে-বসে তো খালি গিলবে, দিতে পারে না আড়াই টাকা ?

রাজলক্ষ্মী পাশের ঘরে কান পাতিয়া ছিলো, একেবারে থাক-যাক অবস্থায় ছুটিয়া আসিল। তীব্রকণ্ঠে কহিল : কেন, কেন তুমি আমার ছেলের গায়ে হাত তুলবে ?

ষোড়শী কহিল : একশো বার তুলবো, বেয়াদপি করলে শাসন করবো না ?

—কী বেয়াদপিটা করেছে শুনি ? ইস্কুলের মাইনে চাইতে এসেছে মাত্র। তা তুমি তাকে শাসন করবার কে ?

—আহা. খালি তাঁদের পেট পুরে দুধ-ভাত খাওয়াও, বেয়াদপি করলেও কাঁধে করে নাচো! মামাবাড়ির আবদারের আর জায়গা পায়নি! ষোড়শী গলা ফুলাইয়া স্বরটাকে একেবারে গদ্গদ করিয়া তুলিল।

রাজলক্ষ্মী দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল: তোমার চুপ করে থাকলে চলবে না কালিকিঙ্কর। রঙ্গলাল কী-এমন অন্যায়টা করেছে যে ওকে চড় মারবে!

কালিকিঙ্করের মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া ষোড়শীই কহিল: ছেলের দোষ তো আপনি দেখতেই পান না! এইটুকু ছেলে—এক চড়ে অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসে—কী তার টাস-টাস কথা! তলে-তলে মায়ের ইশারা না থাকলে এইটুকু ছেলের এতোখানি সাহস হয়?

মাঝে পড়িয়া কালিকিঙ্কর কহিল: হাতে আজ টাকা নেই, একদিন সবুর করলে ইস্কুল তো আর উঠে যাচ্ছে না!

—তা যাচ্ছে না, কিন্তু সামান্য আড়াইটে টাকা তোমার হাতে নেই এ-কথাই বা বিশ্বাস করি কী করে? কর্তার আমলে সামান্য দু'চার টাকার জন্যে এমন গোলমাল তো কই হতে দেখিনি।

ষোড়শী আবার ফোঁস করিয়া উঠিল: কতো খরচ তাও তো কৈ দেখতে পান না। বিশ্বাস না হয় নিজের গাঁট থেকে বের করে দিলেই তো চুকে যায়।

রাজলক্ষ্মী কহিল: সোয়ামির সামনে দাঁড়িয়ে শাশুড়ির সঙ্গে

ঝগড়া করতে তোমার লজ্জা হয় না, বড়-বৌ ? আর, কালিকিঙ্কর, এ-ও আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে ?

কালিকিঙ্কর স্ত্রীকে ধমক দিয়া উঠিল : তুমি যাও না তোমার কাজে।

—আহা, কী আমার শাশুড়ি রে ! বলিয়া ষোড়শী শরীরে একটা মোচড় দিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

কালিকিঙ্কর বলিল : একদিন সবুর করা যাবে না এ-ই বা তোমাদের কেমন-ধারা জেদ।

কোনো জিনিসের প্রার্থী হইয়া পরে প্রত্যাখাত হইবার মধ্যে প্রভুত্বহানির যে দুঃসহ লজ্জা ও গ্লানি তাহা রাজলক্ষ্মী তাহার এই বারো বৎসরের বিবাহিত জীবনে কোনো দিন প্রত্যক্ষ করে নাই। কিন্তু আজ তাহাকে এই অবনতি স্বীকার করিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী শান্ত স্বরে কহিল : কিন্তু আজ ইস্কুলের সব ছেলেই মাইনে দেবে, তার মধ্যে ও না দিলে ওর একটু লজ্জা হওয়াই তো স্বাভাবিক। মাস্টার কিছু যদি জিগগেস করে, কী বলবে তবে ?

—বলবে মাইনে আনতে আজ মনে ছিলো না।

রাজলক্ষ্মী চক্ষু পাকাইয়া রুক্ষ কণ্ঠে কহিল : তুমি ওকে মিথ্যা কথা বলতে বলছ ?

হঠাৎ কুণ্ঠিত হইয়া কালিকিঙ্কর কহিল : তবে বেশ, সত্য কথাই বলতে শিখিয়ে দাও। যেন স্পষ্ট বলে, ঘরে আজ টাকা নেই।

—ও-ও তো মিথ্যে কথা। তা ছাড়া এতে কর্তার মিছামিছি

অসম্মান হয়। বছরের প্রায় দশ হাজার টাকার আয়ের বিষয়-সম্পত্তি যে রেখে গেছে তার ছেলে ঠিক-দিনে টাকার অভাবে ইস্কুলের মাইনে দিতে পাচ্ছে না, এতে লোকে যে টিটকিরি দেবে। সামান্য আড়াই টাকার জন্য তোমার সঙ্গে এমন গলাবাজি করতে হবে এও কিনা আমার কপালে ছিলো ?

কালিকিঙ্কর কটুকণ্ঠে কহিল : গলাবাজি করতে তোমায় কে বলছে ? সামান্যই যখন টাকা, তখন নিজের থেকে চালিয়ে নিতে পারো না ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : আমি চালিয়ে নেবো কোথেকে ? বলতে তোমার একটুও বাধলো না ? কর্তা কি আমার নামে জমিদারি লিখে দিয়ে গেছেন ?

—কী দিয়ে গেছেন না গেছেন তা তুমিই ভালো বলতে পারবে। তা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, মাইনে আজ আমি দিতে পারবো না।

রাজলক্ষ্মী ফাটিয়া পড়িল : কিন্তু শম্ভুর মাইনে তো দিব্যি দিয়ে দিলে। তার বেলায় তো কই টাকার টান পড়লো না।

কালিকিঙ্করের কিছু বলিবার আগেই ষোড়শী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল : কথায়-কথায় আমার ভাইয়ের সঙ্গে এমনি তুলনা দিতে পারবেন না বলে রাখছি।

—তোমার ভাইর সঙ্গে এমনি তুলনা দিতে সত্যিই আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, বড়-বৌ। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,

কালিকিঙ্কর, এ-সংসারে দাবি কার আগে? শম্ভুর, না রঙ্গলালের? হাত-মুখ ঘুরাইয়া ষোড়শী বলিল: যান না, সেটা আদালতে গিয়ে সাব্যস্ত করে আসুন না।

কালিকিঙ্কর ফের ধমক দিয়া উঠিল: তুমি কেন এর মধ্যে কথা বলতে আসো?

—না, আসবে না! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া চাই। পুতু-পুতু করে অনেক সওয়া গেছে, কিন্তু উঠতে-বসতে শুধু-শুধু আমার শম্ভুর সঙ্গে তুলনা দেবে—এ তুমি বারণ করে দাও বলছি। বলিয়া আবার সে অদৃশ্য হইল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: এখনো একটা পেটে ধরোনি বড়-বৌ, তাই সোহাগে একেবারে উপচে পড়ছ! ভগবান করুন, একদিন যেন বোঝো সন্তানের অপমান মা'র বুকে কতোখানি লাগে। পরে কালিকিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিল: বেশ, কার দাবি আগে সেই সাব্যস্তই আমি করবো। যেই জন্মের জোরে তোমার এতোখানি তেজ তা তোমার একচেটে নয়, দয়া করে এটা মনে রেখো।

কালিকিঙ্কর কহিল: কী তুমি করবে?

—সে-পরামর্শ অন্ততঃ তোমার সঙ্গে করবো না। কালকের সকালের ট্রেনে আমাদের এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

কালিকিঙ্কর নির্লিপ্তের মতো কহিল: স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মীর দুই বিশুষ্ক, পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে একটি নিষ্ঠুর, শানিত হাসি ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেলো। সে কহিল : সে-বেলা তোমার টাকার অকুলান হবে না তো? ইশারাটা অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু, নাবালক, অনাথ দুইটি ভাইকে ঠকিয়ে বেশিদিন এই রাজত্ব করা চলবে না, কালিকিঙ্কর। তোমাকে যে নিজের পেটে ধরিনি, আজকের দিনে এই আমার সব চেয়ে বড়ো সান্ত্বনা। বলিয়া কুটিল ও হিংস্র শত্রুতার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস দিয়া সে বাহির হইয়া গেলো।

কঠোর দারিদ্র্য বা হীনতার লাঞ্ছনায় রাজলক্ষ্মী হয়তো পীড়িত বোধ করিত না, কিন্তু এই বৃহৎ সংসারে নিজের অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে এমনি কুণ্ঠিত. সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবে ইহা তাহার নিজের কাছেই ক্ষমার অযোগ্য মনে হইতে লাগিল। দ্বিতীয় পক্ষে পড়িয়া সৎছেলেকে সে সামান্য একটু মন জোগাইয়া চলিত বটে, কিন্তু কখনো তাহার দুই দৃঢ়করধৃত বল্গা এক নিমেষের জন্যও শিথিল করিয়া আনে নাই। তাহার স্থান যেমন সপরিসর ছিলো, তেমনি শাসন ছিলো অপ্রতিহত। সেই স্থানচ্যুতির লজ্জা সে আর বহন করিতে পারিবে না।

কিন্তু কোথায়ই বা সে এখন যায়। সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার ললাটের মতোই শূন্য হইয়া গিয়াছে। তবু সে সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে না, কালিকিঙ্করকে দেখিয়া লইবে। কী যে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে তাহা আদ্যোপান্ত সে অনুধাবন করিতে পারিতেছে

না, পৃথিবীতে জনবল বা ধনবল বলিতে যাহা কিছু, সমস্তই তাহার একজনের সঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তবু সারা রাত্রি ভরিয়া কালিকিঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া সে যে অভিশাপ-বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল তাহাতেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া সে নিশ্চিন্ত রহিল।

কিন্তু সেই দিন মধ্যরাত্রিতেই যে বাড়িতে চোর পড়িবে এমন কথা রাজলক্ষ্মী ঘৃণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। সকালে যথারীতি ঘুম হইতে উঠিয়া গোবর-ছড়া দিতে উঠানে নামিয়াছে, শুনিতে পাইল কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকটা উজাড় হইয়া গেছে—ভিতরে ছিটে-ফোঁটা কোথাও কিছু পড়িয়া নাই। রাজলক্ষ্মী মুহ্যমান অবস্থায় চিৎকার করিয়া উঠিল : আমার গয়নার বাক্স ?
কালিকিঙ্কর কহিল : তাও গেছে।
ষোড়শী ফোড়ন দিয়া কহিল : মোটে তো ক'খানা পাতলা-পাতলা গয়না, তার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে কেমন শোক করছে দেখো না। এদিকে যে সব দলিল-দস্তাবেজ, পাট্টা-তমস্থকের কাগজপত্র, হাতচিঠে খতিয়ান লোপাট হয়ে গেলো সেই কথা ভেবে দেখছে না। বিষয়-আশয় সব তছনছ হয়ে যাচ্ছে সেইদিকে খেয়াল নেই, দু'খানা গয়নার জন্যে সারা বাড়ি কেমন মাথায় করছে দেখো।
লোক-লস্কর পুলিশ-দারোগা—কোনো দিক হইতেই কোনো-কিছুর ত্রুটি ঘটিল না। মহাসমারোহে চাকর-বাকর ঠ্যাঙানো

হইল, মাঠ-ক্ষেত আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু না মিলিল এক ফালি কাগজ, না বা গয়নার বাক্সর এতোটুকু ভগ্নাবশেষ।

রাজলক্ষ্মী জোর গলায় কহিল: সবই যখন গেলো, তখন আর এক মুহূর্তেও আমি এখানে টিকতে পারবো না। আমি দিদির কাছে যাবো, অন্ততঃ রাহাখরচটা আমাকে দিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী যেমন শোরগোল শুরু করিয়াছিল, সে যে আজকের ট্রেনেই বিদায় হইবে এমন কথা কালিকিঙ্কর ভাবিতে পারে নাই। তাই অপরিমাণ উৎসাহের সঙ্গে কহিল: নিশ্চয়। কতো তোমার লাগবে?

—সে তুমিই ভালো বলতে পারবে। তবে যাই কেন না দাও, আমার রঙ্গলাল যদি মানুষ হয় তবে তোমাকে একদিন এই ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবে দেখো।

কালিকিঙ্কর জিভ কাটিয়া কহিল: সে কী কথা? বাবার সম্পত্তি তো খালি আমারই একার অংশ নয়—

—আমিও সেই কথাই বলছিলাম। রঙ্গলাল যদি মানুষ হয়, যদি সে তার মায়ের দুঃখ বোঝে, তবে তোমার এই অপমান কড়ায়-গণ্ডায় সে একদিন শোধ করে দেবে। দাও, বেশি দেরি করো না, ঘণ্টা দুয়েক বাদেই তো ট্রেন।

উত্তরে কালিকিঙ্কর একটু হাসিল; কহিল: কিন্তু কিছুই তো তোমার গোছগাছ হয়নি।

রাজলক্ষ্মী কহিল : গোছগাছ করবার আর কী-ই বা আছে ? দয়া করে কিছু টাকা যদি দাও, তাহলেই হয়।

—বেশ তো, একশোটা টাকাই তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে একজন লোক দিতে হয় তো ? সরকার মশায়ই সঙ্গে যান না। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

রাজলক্ষ্মীর মুখে সেই কুটিল, বিবর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কহিল : দরকার নেই, সেও তো তোমারই লোক—হয়তো কোন সুযোগে সেই টাকাটাই কখন চুরি করে নেবে। বুদ্ধিমতী বলে নিজের মনে-মনে খুব একদিন আমার গর্ব ছিলো, কিন্তু—

রাজলক্ষ্মী ঢোঁক গিলিয়া কহিল : গয়না গেছে যাক, তাই বলে এখেনে থেকে আমার সন্তানদের জীবন বিপন্ন করতে পারবো না। আমি যে তোমার সত্যিকারের মা নই, সেই কথা ভেবেই আজ আমি ভীষণ আরাম বোধ করছি।

কোথা হইতে ষোড়শী খেঁকাইয়া উঠিল : হাঁ করে শুনছ কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ? টাকা কয়টা ফেলে দাও না, পাপ বিদেয় হয়ে যাক।

রাজলক্ষ্মী ছেলে দুইটিকে লইয়া বিদায় হইয়া গেলো।

দুই

বিক্রমপুরের অখ্যাত একটি গ্রামে রাজলক্ষ্মী তাহার দিদির আশ্রয়ে আসিয়া উঠিয়াছে। বাপের বাড়ির দিকে এই দিদি ছাড়া তাহার আর কেহ বান্ধব নাই, কিন্তু দারিদ্র্যে যাহাকে সে এতোদিন সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, আজ কি না তাহারই কাছে উপযাচিকা হইয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। দিদি তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইলেন ও তাহার সর্বনাশী প্রতি-হিংসা স্পৃহার আগুনে দিনে-দিনে অনুকূল বায়ুসঞ্চার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বুদ্ধি করিয়া কালিকিঙ্কর মাসে-মাসে নিয়মিত কিছু টাকা পাঠাইয়া সেই আগুন ক্রমশঃ নিস্তেজ করিয়া আনিল! নিদারুণ দারিদ্র্যে রাজলক্ষ্মীর সেই উগ্র তেজ স্তিমিত হইয়া আসিল। মনি-অর্ডারে দস্তখৎ করিয়া সে-টাকা তো সে গ্রহণ করিতই, এমন-কি বলিয়া বেড়াইত: আমি তো কোনো কালে টাকা-পয়সার কাঙাল ছিলাম না, দিদি, সংসারে সেই যে আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেলো তাই আমার সইলো না। নইলে আমার আর এখন দুঃখ কী

বলো ? আমার রঙ্গলাল-পান্নালাল মানুষ হয়ে উঠছে, আমার সেই গৌরব তো আমি আবার ফিরে পেলুম বলে।

দিদি নতমুখে বলিয়া উঠিতেন : কিন্তু ন্যায়ত যারা এতো টাকার মালিক, তাদের এই হাড়ির হাল তুই মা হয়ে সইছিস কী করে ?

রাজলক্ষ্মী মালা ফিরাইতে-ফিরাইতে কহিত : না সয়ে কী করি বলো ? তবু ওদের পড়ার খরচটা যে চলে যাচ্ছে সেই ঢের। কালিকিঙ্কর যে একদম হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি সেই আমার ভাগ্যি ! কি করে যে ওর সেই সুমতি হলো তাই কেবল ভাবছি।

—সুমতি না ছাই ! এটা যে ওর কী ভীষণ চালাকি তা তুই বুঝতে পাচ্ছিস না ? ঐ সামান্য ক'টা টাকার ঘুষ দিয়ে তোকে ও মামলা করার থেকে নিরস্ত করে রাখছে।

রাজলক্ষ্মী উদাসীনের মতো কহিত : আর আমি কোত্থেকে মামলাই বা করতে পারতাম বলো। ভাগ বাঁটরা করে আলাদা হয়ে এলেই বা কি সুরাহা হতো ? মেয়েমানুষ—মন স্থির করে পূজোর দুটো মন্তরই পড়তে পারি না—তায় অতো বড়ো সম্পত্তি সামলানো ! ছেলেরা যখন সাবালক, লায়েক হয়ে উঠবে, তখন তারাই তাদের ভাগ-বণ্টন বুঝবে—মামলা-মোকদ্দমা করতে হয় তারা করবে—আমি তার মধ্যে মাথা গলাতে যাই কেন ?

দিদি রুষ্ট হইয়া বলিতেন : গোড়ায় তো খুব তড়পেছিলি।

রাজলক্ষ্মী ম্লান হইয়া বলিত : তখন দিদি, স্ত্রীলোকের কোথায় যে

সব চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য, সেইটেই মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে ছিলো। স্বামীকেই যখন হারালাম, তখন তাঁর সম্পত্তিটার ওপর নিজের জন্যে লোভ না করাই আমার উচিত ছিলো। আমার মূল্য—আমি মা, আমার সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা আমার সন্তানের শ্রদ্ধায়। ওরা মানুষ হয়ে উঠলেই আমি আর কিছু চাই না।

—কিন্তু এই মানুষ হয়ে উঠতেই তো বিস্তর টাকার দরকার। নিজের সম্পত্তি থাকতে কেউ কখনো এমনি ভিখিরি সেজে বসে থাকে নাকি?

—সেই কথাই তো বললাম দিদি—ওদের জিনিস, পারে ওরা কেড়ে-ছিঁড়ে নেবে—সত্যি কথা বলতে, আমার তো কোনো দাবি-দাওয়া নেই। আইনের চোখে ওদের সাবালক হতে দাও, ওরা এই বঞ্চনা কক্‌খনো সইবে না। কিন্তু আমি এর ভেতর থাকতে চাই না, আমি আমার এই পট আর পুতুল নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবো।

দিদি অস্থির হইয়া বলিতেন: কিন্তু মিছামিছি সবুর করতে যাবি কোন দুঃখে? এখুনিই তো নাবালকের পক্ষে মামলা রুজু করে দেয়া যায়। টাকা-কড়ি নেই, কিন্তু সেই যে কি 'পাঁপর' হয়ে মামলা করা যায়, আরজির কোর্ট-ফি লাগে না—তাই করতে তো কোনো বাধা ছিলো না। হাকিমের খাসকামরায় গিয়ে দরখাস্ত-দাখিল করে দিয়ে এলেই হলো। আমাদের শ্যামাচরণ উকিল তো তাই বলছে—মাত্র আটআনা নাকি খরচ!

রাজলক্ষ্মী মলিন করিয়া হাসিয়া বলিত: সেইটে খুব সম্মানের হতো না, দিদি। তা ছাড়া—

দিদি মুখ ঝামটাইয়া উঠিতেন: আর এই যে সোয়ামির ভিটে থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলো—সেইটেই খুব সম্মানের হয়েছে? দিন-কে-দিন তোর সম্মানের জ্ঞান যে খাসা টনটনে হয়ে উঠছে, রাজী।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিত; বলিত: বললাম না দিদি, সেই অপমানের শোধ নিতে হয়, আমার রঙ্গলাল আছে—তার জন্যে তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এখুনিই আমি মামলা করতে পারতাম বটে, কিন্তু চারদিকে যে বিচ্ছিরি আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠতো তাতে আমার ছেলে-দুটির মানুষ হবার পক্ষে বাধা হতো, দিদি। নিতান্ত ওদের পড়াশুনো যখন চলছেই, তখন আর বিশেষ মারামারি করে লাভ নেই। সম্পত্তি আমার হাতে থাকলেও ওদের এই দারিদ্র্যের কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়েই এগোতে হতো। তুমি ভাবছ তাহলে আমি ওদের ইস্কুলে যাবার জন্যে গাড়ি ও বাড়িতে পড়া বলে দেবার জন্যে চার-পাঁচটা মাস্টার রেখে দিতাম? ককখনো না। পৃথিবীতে কী বড়ো বলো—সম্পত্তি, না, চরিত্র?

তর্কে পরাস্ত হইয়া দিদি উঠিয়া পড়িতেন; বলিতেন: বাজে কথায় তোর সঙ্গে কে পারবে বাপু। কিন্তু শখ করে এতো টাকার সম্পত্তি কেউ ছেড়ে দেয়, এমন কথা বাপের জন্মে কেউ কখনো শোনেনি।

—কে ছাড়তে যাচ্ছে বলো ? ছেলেদের সম্পত্তি, বড়ো হয়ে তারা তার দায় সামলাবে। যা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য, যাতে তাদের জন্মগত অধিকার, তা যদি তারা বর্জন করে তাহলে তো তাদের আমি কাপুরুষ বলবো। কিন্তু আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না— আমার ওতে কী দরকার! বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার পূজার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

দিদি বলিতেন : কিন্তু এইটুকুন বয়সে তোর পূজো-আচ্চা নিয়ে এই মাতামাতি আমি আর দেখতে পারি না, রাজী। তুই শেষকালে সন্নেসি সাজবি নাকি ?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিত : ঐ সাজতেই পারবো, দিদি, কোনো কালে আর হতে পারবো না। আমি যে কী ভীষণ লোভী, কী নিদারুণ তামসিক, তা ভেবে নিজেই আমি শিউরে উঠি। তুমি জানো না দিদি; মূর্তিটা অবিশ্যি মহাদেবের, কিন্তু পূজো করি আমি আমার রঙ্গলালকেই। ধর্ম বলো, অর্থ বলো, আমার জীবনে ঐ একমাত্র রঙ্গলাল।

দিদি মুখ ভার করিয়া বলিতেন : কিন্তু বেশিদিন আলগা দিলেই টের পাবি ওদিকে একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে। শেষকালে একটা ফুটো পয়সাও দেখিস জুটবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাজলক্ষ্মী বলিত : সেই জন্যেই তো মাঝে-মাঝে ওদের বলি, সময় থাকতে একটা হিল্লে করিস, পরে নইলে পস্তাতে হবে। কিন্তু রঙ্গলাল কিছুতেই কান দেবে না। আমারো

তাই এ্কেক সময় মনে হয়, দিদি, ও যাবারই যদি হয়, যাক, আমার তো রঙ্গ-পান্নাই আছে।

রাজলক্ষ্মী সেই কল্পনায়ই রাত্রি-দিন বিভোর হইয়া থাকিত। ঘূর্ণ্যমতী পৃথিবীর দুই মেরুপ্রান্তের মতো তাহার জীবনে এই দুটি সন্তান, যাযাবর প্রাণের দুইটি স্থির, অপরিবর্তনীয় আশ্রয়স্থল—জীবন ও মৃত্যু, স্বর্গ ও পৃথিবী। তাহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত, তাহার দুই দৃষ্টিময় বিশাল চক্ষু, তাহার চঞ্চল দুই পদ, তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক। কতো দুঃখে সে তাহাদের মানুষ করিতেছে। তাহার প্রশান্ত হাসিতে রূঢ় দারিদ্র্য স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—কোথাও তাহার এতটুকু নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের ছিদ্র রাখে নাই। রোগে অজস্র সেবা, অপরাধে অকৃপণ দাক্ষিণ্য, নির্জীবতায় সবল অনুপ্রাণনা—দুইটি সন্তানকে কোথা হইতে সে কোথায় লইয়া আসিল! সমস্ত প্রতিকূল পৃথিবীকে সে তাহাদের মাতৃ-জঠরের মতোই নিরাপদ, নির্জন রাখিয়াছে। তাহারা তাহার আপন দেহের রক্ত, আপন যৌবনের নিভৃত-লালিত স্বপ্ন, আপন সৃষ্টির গৌরবময় অধিকার।

সে সত্যই এইবার রাজলক্ষ্মী। সংসারে এই জ্যোতির্ময় প্রতিষ্ঠাই তাহার চিরজীবনের ধ্যানের বস্তু ছিলো, সহজ অধিকারের গর্বে তাহাই সে এতদিনে পাইতে বসিয়াছে। গত বছর লাঙ্গলবন্দের স্নানে যাইবার জন্য গ্রাম-শুদ্ধু মেয়ের দল তাহাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী কিছুতেই রাজী হয় নাই।

বলিয়াছিল: আমার রঙ্গলাল ছাড়া আমি আর কোনো তীর্থ জানি না, রাঙামাসি। রঙ্গলাল কয়দিনের ছুটিতে আমার কাছে একটু এসেছে, আমি ওকে ফেলে যেতে পারবো না কোথাও।
রাঙা-মাসি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল : অতো বড়ো ধাড়ি ছেলেকে এখনো তুই আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখবি নাকি? ছেলেকেও বাবা বলিহারি, কই নিজে থেকে মাকে তীর্থে পাঠাবে, তা না, কেবল চব্বিশ ঘণ্টা মা'র পিছে পিছে। তোর এই সাত দিনের ছুটিতে কলেজের পড়া ছেড়ে এখানে ছুটে না এলে চলতো না রে, রঙ্গলাল? রঙ্গলাল দুই হাতে শিশুর মতো মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল : মাকে ছেড়ে দু'দণ্ড থাকতে পারি না, রাঙা-দিদিমা। আমি চাকরি করে যখন বাসা নেব, তখন সেই হবে মা'র অনন্ত তীর্থ।

তিন

আরো কয়েকটা বৎসরের পর রাজলক্ষ্মীকে আমরা যেখানে দেখিতে পাইলাম, তাহা সর্বগ্রাসিনী পদ্মার পারে অখ্যাত সেই গ্রামে নয়, বঙ্কুর তীর্থপথে নয়—একেবারে জনযানমুখর লৌহলোষ্ট্রকণ্টকিত কলিকাতা রাজধানীতে—ব্যস্ত ও উজ্জ্বল সংসার-সন্নিবেশের মধ্যে। রাজলক্ষ্মীকে এখন দেখে কে! রাহুস্পর্শক্লিষ্ট চন্দ্রের মতো সে এতো কাল কুণ্ঠিত ছিলো, আজ সংসার-আকাশে তাহার সমুচ্ছ্বসিত মুক্তি!

ভবানীপুরের দিকে রঙ্গলাল সুন্দর দেখিয়া দোতলা একখানা বাড়ি নিয়েছে। মাসে বিয়াল্লিশ টাকা ভাড়া। দক্ষিণ-মুখো বাড়ি, দোতলায় এক জনের গা ছড়াইবার মতো চওড়া বারান্দা, উপরে-নিচে নিয়া মোট ছয়খানা ঘর। কল, বাথরুম, পায়খানা—সব দুইটা করিয়া—ফুল-গাছ বা দুয়েকটা শাক-সবজি করিবার জন্য সামান্যটাক মাটিও এককোণে পড়িয়া আছে—নিচে কলতলার কাছে একটি বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ। বাড়ি দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর খুশি আর ধরে না। কোন ঘরটা ভাঁড়ার, কোনটা নিরিমিষ্যি, কোনটাতে

রঙ্গলাল শুইবে, কোনটাতে পান্নালালের পড়ায় মন লাগিবে, এই সম্বন্ধে তাহার আদেশের উপর কোনো আপিল চলিবে না। তাহার সেই অপ্রতিহত কর্তৃত্বের যুগ আবার ফিরিয়া আসিল। রঙ্গলাল এম-এ'টা পাশ করিয়াই কোন এক উচ্চপদস্থ ইংরেজের সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারই সুপারিশে সে এক সওদাগরের আপিসে সহকারী কর্মচারীর পদ পাইয়া গেলো— গোড়াতেই তাহার আড়াইশো টাকা মাহিনা হইয়াছে। চাকরিটায় কায়েমি হইবার আভাস পাইতেই রঙ্গলাল হাত-পা ছড়াইবার জন্য একখানা বাড়ি ভাড়া করিল, মেস হইতে পান্নালাল তাহার বই খাতা নিয়া উঠিয়া আসিল, বিক্রমপুরের সেই অখ্যাত গ্রাম হইতে মা আসিল, মাসিমা আসিলেন, তাঁহার নাতনি মাতা-পিতৃহীনা বছর তেরো-চোদ্দ বছরের নলিনীই বা আর কোথায় যাইবে!

রঙ্গলাল কহিল: ওপরের এই বড়ো ঘরখানাই আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ কী, মা? এটা তোমরা নাও, তিনজনে থাকবে—অনেকখানি জায়গার দরকার। আমার তো এখন আর পড়াশোনার হাঙ্গামা নেই—আসবাবের মধ্যে একখানা তক্তাপোশ। আর কাজের মধ্যে আপিস থেকে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করা—ঐ কোণের ঘরটাতেই আমি বেশ থাকবো।

রাজলক্ষ্মী বালতির জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া ঘরের মেঝেটায় ঘষিতে-ঘষিতে কহিল: তোর পরামর্শ আমি নিতে বসিনি,

খোকা। তুই খালি সায় দিয়ে চলবি, বুঝলি ? আমার কথার ওপর কথা বলতে আসবি না। ঘরে একখানা খালি তক্তাপোশ পাতলে চলবে না, দস্তুরমতো টেবিল চেয়ার আলনা-আলমারি পাততে হবে—আজো তুই এমনি হতচ্ছাড়া হয়ে থাকবি নাকি ?
রঙ্গলাল হাসিয়া কহিল: আস্তে মা, আস্তে। দরকার যতো কমানো যায়, ততোই তো সুখ।
—তোর তত্ত্বকথা রেখে দে এখন। আজ আমি আর কোনো কথা শুনবো না, রঙ্গ। স্বর্গ থেকে কর্তা এতোদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। জাঁক করতে নেই জানি কিন্তু তোকে আর আমি এমনি কাঠখোট্টা অসভ্যের মতো থাকতে দেবো না ককখনো। কী কেবল ছেঁড়া জামা গায়ে দিস, চটের মতো কাপড় কিনিস, জুতোর একটা পাটিতেই প্রায় ছাপ্পানটা তালি পড়েছে—কেন, কেন তোর এই দুর্দশা ? তোর অভাব কিসের ?
—কী যে তুমি বলো, মা ? এই তো সেদিন মোটে চাকরি পেলাম।
রাজলক্ষ্মী তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাহিয়া কহিল: কিন্তু এই মাইনেই তো তোর একমাত্র আয় ছিলো না—
ইঙ্গিতটা রঙ্গলাল স্পষ্ট আয়ত্ত করিল। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কথাটাকে সে ঐখানেই চাপা দিয়া রাখিল।
রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া রঙ্গলাল বলিল: একটা ঠাকুর রাখি, মা। কী তুমি দু'বেলা রাঁধবে ?

—আহা, কী যে বলিস ? আমাকে চুপচাপ বসিয়ে রাখলেই বুঝি মায়ের ওপর খুব মায়া দেখানো হলো ! এই যে দু'বেলা নিজের ইচ্ছেমতো রেঁধে-বেড়ে তোদের সামনে থালা ধরছি এ যে আমার কতোখানি সুখ, তা তোরা কী বুঝবি বল ? কতো দিন তোদের পেট ভরে খাওয়া আমি দেখতে পাইনি।

পান্নালাল কহিল : ঠাকুর রাখলে আমার পক্ষে ঠিক লাভ না হলেও এমন মারাত্মক ক্ষতি হতো না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল : কেন, তোর আবার কী হলো ?

—ঠাকুর রাখলে হয়তো দিনের পর দিন এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব চলতো না, তার ভুল করার অন্ততঃ একটা স্বাধীনতা থাকতো। তুমি যে দু'বেলা বেছে-বেছে বড়ো মাছখানাই মেজ-দা'র পাতে দেবে এ আর আমি সইতে পারি না। তোমার কি একদিনো ভুল হতে নেই, মা ?

রাজলক্ষ্মী ও রঙ্গলাল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী কহিল : ঠাকুর রাখলেও সে সব সময়েই মনে রাখতো কার কাছ থেকে মাস-মাস সে মাইনে পাচ্ছে। ভুল তারো হতো না।

—অন্ততঃ তাকে গোপনে ডেকে ধমকে দিতে পারতাম। দু'চার পয়সা এ-দিক ও-দিক ঘুষ দিলেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। কিন্তু তুমি সমস্ত শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছো। নাঃ, আমাকেও একটা চাকরি নিতে হলো দেখছি। কী কুক্ষণেই যে ক'টা বছর পরে এসে জন্মালাম—বিধাতা এ-ভুল আর কোনো দিন সংশোধন করলেন না।

কলেজ হইতে টাইমে-বেটাইমে ছুটি পাইয়া পান্নালাল যখন-তখন তাহার খেলা-ধূলা আড্ডা-আখড়ার সন্ধানে বাহির হইয়া যায়, রঙ্গলাল আপিস হইতে ফিরিয়া সাহেবি পোশাক ছাড়িয়া জল-খাবারের থালা লইয়া চুপিচুপি মা'র কোল ঘেঁষিয়া বসে, এটা-ওটা লইয়া কতো বাজে ও কাজের কথা হয়। অদূরে মাসিমা বসেন, সারাদিনের শ্রান্তির পর ম্লান প্রদোষচ্ছায়াটি কেমন স্নিগ্ধ, অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে।

রাজলক্ষ্মী বলে: বিকেলে একদিন বায়স্কোপে গেলেও তো পারিস। কেমন যেন তুই একটু বুড়োটে হয়ে পড়ছিস, খোকা।

রঙ্গলাল তাহার কামানো গোঁফের জায়গায় আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে কহিল: টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করলেই তখন তাকে ব্যয় করা নিয়ে ভাবনা ঢোকে—একটু বুড়ো না হয়ে উপায় থাকে না। বায়স্কোপ দেখবো কী, মা! ঐ মিছিমিছি কতোগুলি পয়সা বেরিয়ে যাবে—মনটা যেন কেমন সায় দেয় না।

রাজলক্ষ্মী কহিল: না, তুই যা, আমি তোকে টাকা দিচ্ছি। নিজের জন্যে কিছুই তুই খরচ করবি না, এ আমি দেখতে পারি না।

—নিজের জন্যে খরচ করছি না মানে? তোমরাই কি আমি নিজে নয়? তুমিই বলো দেখি মাসিমা, এই কি আমার টাকা উড়োবার সময়? আমার এখন টাকার কতো দরকার। পান্নাকে যে আমার বিলেত পাঠাতে হবে তার খবর রাখো?

—হবে, হবে, সে জন্যে তোর ভাবতে হবে না। সে-টাকার ব্যবস্থা আছে। পান্না তার এখানকার পড়া সাঙ্গ করুক, তার বিলেত যাওয়া আর বসে থাকবে না। বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার বাক্স হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া আনিয়া রঙ্গলালের হাতে গুঁজিয়া দিল।

রঙ্গলাল চমকাইয়া উঠিল : এ কী, মা? এতো টাকায় কী হবে?

রাজলক্ষ্মী তাহার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল: খুব ভালো দামি সিটে বসে বায়স্কোপ দেখবি। আমার মাথা খাস! আপত্তি করতে পারবি নে।

বলিয়া অনেক করিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া রঙ্গলালকে সে রওনা করাইয়া দিল।

দুই চক্ষু দিয়া বহুদূর পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী দিদির কাছে আসিয়া বসিল। শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে কহিল: সেদিনের কথা কিছুতেই আমি ভুলতে পারবো না, দিদি। পাবনায় সেবার নতুন বায়স্কোপ এসেছে। ছেলেদের মহলে তখন বেজায় ফুর্তি। কালিকিঙ্করের শালা শম্ভু নতুন জামা-জুতো পরে ফিট্‌বাবু সেজে চাকরের সঙ্গে বায়স্কোপ গেলো; খোকা আমাকে এসে বললে— 'আমিও যাবো, মা!' আমি বললাম 'তোর বড়-দার কাছে বল গে যা।' খোকা ফিরে এসে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে—'বড়-দাকে বললাম, মা, কিন্তু তিনি আমাকে পয়সা দিলেন না। শম্ভু দা একা-একা চলে গেলো।' মোটে চারআনা পয়সাও আমার হাতে

ছিলো না। অগত্যা কি করি, ছেলেটাকে ঠেসে ধমকে দিলাম। ও শুধু মলিন ছলছল দুটি চোখ মেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সেই ওর সেদিনকার ব্যথাভরা, অসহায় চাউনি আমার বুকের মধ্যে এখনো জেগে আছে। দিদি, আমার সেই খোকা।

সেই খোকা আজ তাহার কতো বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় তাহাকে বুঝিয়া ফেলে কাহার সাধ্য। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে প্রত্যেকবার সে হারিয়া যাইত, জখম হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহারই হাতে আবার তাহাকে একচোট নাকাল হইতে হইত—তাহার সেই দুর্বল, স্বল্পভাষী, কৌশলবুদ্ধিহীন, নিরীহ খোকা—আজ কেমন দীর্ঘায়ত, সুন্দর, বলশালী হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর তাহার সঙ্গে কেহ পারিবে না। সেই খোকা একদিন যে গোলাপছড়ি খাইতে সামান্য একটি পয়সার জন্য তাহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল, আর রাজলক্ষ্মী নিজের অভাব লুকাইতে গিয়া তাহাকে ধমকাইয়া বিদায় দিলে পর সারা দুপুরবেলা বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল কোথাও একটি পয়সা পাওয়া যায় কি না—সেই খোকা আজকাল মাস ফুরাইলেই, অবলীলাক্রমে, আড়াইশো-টা টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দেয় — অথচ তাহা হইতে নিজের অবান্তর খরচের জন্য একটি পয়সাও তুলিয়া নিতে তাহার হাত উঠে না! পান্নালালকে ডাক্তারি পড়াইতে জার্মানিতে না কোথায় পাঠাইবে বলিয়া সে এখন হইতেই টাকা জমাইতেছে। কিন্তু এই কারণে টাকা-জমানোটা

রাজলক্ষ্মী ততো পছন্দ করে না—পান্নালালের ভার সে একাই বা বহিতে যাইবে কেন। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা, দুইটি ভাই তাহাদের জীবন-ধারণের তথ্যটা প্রখর সমারোহে চতুর্দিকে বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়, তাহাদের দেখিয়া ষোড়শীর চক্ষু দুইটা তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলিতে থাকুক। তাই রঙ্গলালের এই বীতস্পৃহ, ভোগনির্লিপ্ত, উদাসীন ভাব-ভঙ্গি সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না—তাহার এই আয়াসকৃত দীনতার মাঝে আজো যেন সেই পরাজয়ের কালিমা লাগিয়া আছে।

তবু এই সংসারে তাহার বিস্তীর্ণ একাধিপত্য, সেই নির্বিশেষে নির্বারিত স্বাধীনতায়ই রাজলক্ষ্মী মত্ত হইয়া আছে। সামান্য তরকারি কোটা হইতে শুরু করিয়া বড়ো-বড়ো খরচে পর্যন্ত তাহারই অবারিত হাত। তাহারই হাঁক-ডাকে সবাই উঠে-বসে; মা বলিতে ছেলেরা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। রঙ্গলাল বলে : তাই বলে তুমি রোদ্দুরে বসে গুল দিতে যাবে কেন, মা?

রাজলক্ষ্মী বলে : তোর টাকা বাঁচাচ্ছি।

—বা, ওতে আর ক'পয়সা বাঁচবে? দু'বেলা উনুনের আঁচে থেকে আবার যদি তোমাকে রোদ্দুরে গুল দিতে বসতে হয়, তবে যে মা, তোমার শরীর থাকবে না।

—কিন্তু এতো খাটা-খাটনির পরে তুই যে টাকা খরচ হবে বলে ভালো-ভালো খাবার খাবি না, তাতেই বুঝি তোর শরীর থাকবে? চেহারাখানা কী হচ্ছে দিন-দিন, খেয়াল আছে?

রঙ্গলাল হাসিয়া বলে : হপ্তায় ওজন নিচ্ছি, মনের সুখে বেড়েই চলেছে মা। মা'দের এমনি চোখ সন্তানকে তারা কোনোদিন সুস্থ দেখতে পারে না, কেবলই অভাবগ্রস্ত মনে করে। তুমি যখন আমার আছ, তখন আমার আর কী চাই ? বলিয়া রঙ্গলাল মাকে ধরিবার জন্য আগাইয়া আসে।

রাজলক্ষ্মী পিছনে দুই পা হটিয়া যায় : ঐ ময়লা কাপড়ে আর ছেঁড়া জামায় তুই আমাকে ছুঁতে পারবি না, খোকা। এ-ছুটে ধোপাবাড়িতে চারখানার বেশি কাপড় পাঠালে তোর জাত যেতো ? তুই নিজে রোজগার করছিস না ? কেন তুই নিজ হাতে তোর গেঞ্জি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর কাচবি শুনি ?

—অনেক দিনের অভ্যেস, মা। ওতে আমার কিচ্ছু অসুবিধে হয় না। মুখ-ধোয়ার মতো ওগুলোকে আমি নিত্য কর্ম বলে ধরে নিয়েছি। কতো পাপীকেই মা কোল দেন, এ তো তাঁর এক ময়লা ছেলে। বলিয়া রঙ্গলাল মা'র গা ঘেঁষিয়া নিজ হাতে গুল পাকাইতে বসে : তোমাকে মিছিমিছি এমনি খাটিয়ে মারছি। এবার একটা ঠাকুর রাখবো।

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়ে উঠে : খবরদার, খোকা। মাসে-মাসে দশটা টাকা তোর বেরিয়ে যাবে।

—তুমি কি আমার টাকা বাঁচাবার জন্যেই এমনি দেহপাত করছ নাকি ?

—এখন তো কেবল তাই মনে হচ্ছে। রাজলক্ষ্মী বলে : টাকার

জন্যে তুই তোর নিজের শরীর ক্ষয় করতে পারিস, তার থেকে আমার দেহটার দাম বেশি নাকি ? হ্যাঁ, ভালো কথা, ঠাকুর রাখবি বৈ কি, আর আমি ভাবছি এবার একটি ঝিও রাখতে হবে।

রঙ্গলাল বলে : আবার ঝি কেন ? চাকরই তো আছে।

মাসিমা হাসিয়া বলেন : সে ঝি নয় রে মূর্খ—

অর্থ-টা বুঝিয়া রঙ্গলাল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে ; বলে : ও-সব বাবুগিরিতে আমার রুচি নেই। পান্নাকে আগে বিলেত পাঠাই।

রূঢ় শাসনের সুরে রাজলক্ষ্মী কিছু একটা বলিবার আগেই রঙ্গলাল দ্রুত পায়ে কাটিয়া পড়ে।

সেইদিন রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহার দিদিকে সারথি করিয়া রঙ্গলালকে সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ করিল। পাত্রী স্থির হইয়া আছে—সিভিল-সার্জন মহেন্দ্র ঘোসের মেয়ে, দেখিতে—বর্ণনায় মাসিমা কালিদাসকেও প্রায় পরাস্ত করিলেন। নগদ পাঁচটি হাজার টাকা তো দিবেই, তাহার উপর মোটর ও দানসামগ্রী—যা রঙ্গলাল চায়।

কথা শুনিয়া রঙ্গলালের ঠোঁটের কাছে তীক্ষ্ণ একটি হাসি বিদ্ধ হইয়া রহিল ; কহিল : একেবারে সব ঠিকঠাক ? আমাকে একবার জিগগেস করবারো দরকার মনে করোনি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : আমি কি তোর জন্যে যা-তা একটা মেয়ে ধরে

নিয়ে আসবো নাকি ? আমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোর কেউ আছে নাকি পৃথিবীতে ?

তাহা নিশ্চয় নাই, কিন্তু একমাত্র আকাঙ্ক্ষাতেই জীবনের কতোখানি শুভ হইতে পারে তাহা সেই মুহূর্তে রঙ্গলাল কিছু ভাবিয়া পাইল না।

মাসিমা বলিলেন : তোর মত না পেলে তো আর পাকা কথা দেয়া যেতে পারে না। এই সামনের রাস্তায়ই তারা আছে, একদিন মেয়েটিকে দেখে আসবি চল।

রঙ্গলাল আশ্বস্ত হইল। গম্ভীর গলায় কহিল : বাঁচালে যা হোক। তবে আগে-ভাগেই আমার পাকা কথাটা দিয়ে রাখি, মা।

রাজলক্ষ্মী ও দিদি কথাটা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

রঙ্গলাল কহিল : মিছিমিছি বাইরের এই আপদ জোটাবার এখন আমার একেবারেই সময় নেই, মা। আমার কতো কাজ। কতো বড়ো দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে। আমি না-হয় চাকরিতে ঢুকে নিজেকে দিনে-দিনে ছোটো করে ফেলবো, চারদিকে সংস্কার আর আচারের বেড়া তুলে নিশ্চিন্ত জীবনে প্রত্যহ আরাম খুঁজে বেড়াবো, জীবনে কোনো নতুন পরীক্ষায় হাত দিতে পারবো না, কিন্তু তাই বলে পান্নাকে আমি কখনো এমনি গতানুগতিক হতে দেবো না। সে হবে মৌলিক, স্বাধীন, অসাধারণ। তাকে এই বিরাট পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে পথ আমাকে তৈরি করে দিতে হবে, মা। তা ছাড়া জীবনে এখন আমার আর কোনো

সাধনা নেই। বাঙলাদেশের পাত্রীরাও সব সঙ্গে-সঙ্গে বিলেত চলে যাচ্ছে না, মা, ছুটি দিন আরো সবুর করো।

রাজলক্ষ্মী মেঝের উপর গ্যাঁট হইয়া বসিল। কহিল : পান্নাকে বিলেত পাঠাবি, সে তো ভালো কথা। বুক ফুলিয়ে দশ জনের কাছে সে-কথা আমি বলে বেড়াতে পারবো। কিন্তু তার জন্যে তুই শুকিয়ে মরবি কেন? তার নিজের টাকা আছে না?

—তার নিজের টাকা! পান্না আবার টাকা পেলো কোত্থেকে?

—কেন, কর্তা কি তোদের একেবারে কিছুই দিয়ে যাননি নাকি? এক ছেলেই সমস্ত বিষয়-আশয় লুট করে চেটে-পুটে খেয়ে সাবাড় করে ফেলবে, আর তোরা ছু'ভাই হাঁ করে বসে থাকবি? নিজের থাকতে কেন তোদের এই অনর্থক কষ্ট করতে হবে? অনেক হয়েছে, অনেক সয়েছি—যখনই বলতে গেছি, তুই ছুই হাতে আমার মুখ চেপে ধরেছিস, কিন্তু আর আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। পান্নার বিলেত যাবার সঙ্গতি থাকতেও, তোকে শেষকালে তার জন্যে বিয়ে পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হবে, এ আমাকে তুই সহ্য করতে বলছিস?

মাসিমা কহিলেন : আর যা-সব শুনছি, কালিকিঙ্কর এতোদিনে প্রায় সব শেষ করে এনেছে। এখনো সময় আছে, আরো কিছু দিন সবুর করতে গেলেই সব একদম সাফ হয়ে যাবে।

রাজলক্ষ্মী নির্মম কণ্ঠে বলিল : আমি বলিনি? কতো আগে থেকেই তো বলছি, কিন্তু পড়াশুনোর ব্যাঘাত হবে বলে গা

করেনি, কেবল বলেছে—'জীবনে দুঃখের খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকা ভালো, মা।' কিন্তু এখন তোর দুঃখটা কিসের শুনি? যা হক্ টাকা, তা কেন তুই এখন দাবি করবি না? এতো যার অভাব, এতো যার দায়িত্ব, টাকা থাকতে কেন সে তা হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে না শুনি?

রঙ্গলাল কহিল : পান্নার বিলেত যাওয়ার খরচের টাকা এখন যদি আমাকে বড়-দা'র সঙ্গে মামলা করে নিতে হয়, মা তাহলে বুক ফুলিয়ে পাঁচ জনের কাছে কোন মুখে কী বলে বেড়াবে?

—নিশ্চয় বলে বেড়াবো। রাজলক্ষ্মী মেরুদণ্ড টান করিয়া বসিল : বলে বেড়াবো যে, আমার রঙ্গলাল অন্যায়কে কোনোদিন ক্ষমা করতে শেখেনি, যা তার নিজের অধিকারের জিনিস, তা সে জোর করে কেড়ে নিতে জানে।

রঙ্গলাল বাহিরে একটুও বিচলিত হইল না। তেমনি শান্ত, উদাসীন কণ্ঠে কহিল : তা নিয়ে হঠাৎ আজকে এতোদিন বাদে ব্যস্ত হয়ে লাভ কী, মা? বরং আজকেই তো তার প্রয়োজন কমে এসেছে—আশা করি সম্পত্তির আয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দিনে-দিনে তা আরো কমবে।

মাসিমা কহিলেন : কিন্তু তাই বলে তোদের পাওনা অংশ ছেড়ে দিবি নাকি?

—সে-অংশে বিশেষ আর কিছু নেই, মাসিমা। খবর যা শুনেছ তা একেবারে মিথ্যে নয়—অনেক সম্পত্তিই বড়-দা'র নিজের ধার

শোধ করতে উড়ে গেছে। এখন কী আর পাওয়া যাবে বলো? আর তুচ্ছ দু'চার হাজার টাকার জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই বাধালেই বা আমাদের কী এমন সম্মান বাড়বে!

রাজলক্ষ্মী অস্থির হইয়া উঠিলেন: তবে দেখলি তো, নিজে কেমন সব একা শুষে নিলো। তোরা উপযুক্ত হয়ে উঠেও যদি এর প্রতিবিধান না করিস তো চলবে কেন?

রঙ্গলাল আর্দ্রকণ্ঠে কহিল: চলে তো মা যাচ্ছেই, বরং বড়-দা'রই ভালো চলছিলো না। ঐ সম্পত্তিটা ছিলো বলেই তিনি কোনো রকমে ছেলেপুলে নিয়ে এখনো দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছেন, নইলে যে কোথায় ভেসে যেতেন তার ঠিক নেই। মোক্তারি করে একটা পয়সাও রোজকার করতে পারেন নি, তার ওপর বাবার আমলের সেই সাবেকি চাল সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। সম্পত্তিটা হাতে না থাকলে কোত্থেকে তিনি এ-সব সামলাতেন বলো।

—সামলে-সামলে সব তো শেষ করে আনলো। শেষে তো তোদেরই একদিন গলগ্রহ হবে।

রঙ্গলাল কহিল: আমরা দু'ভাই যদি সত্যি মানুষ হতে পারি, মা, তবে বড়-দা'কে আমরা ফেলে দেবো নাকি?

রাজলক্ষ্মীর মুখ-চোখ অসহ্য অপমানে জ্বালা করিয়া উঠিল। কহিল: শুনলে কথা, দিদি? এই করেই ওরা মায়ের সম্মান রাখবে?

রঙ্গলাল মা'র কাছে নামিয়া আসিল; কহিল: বাইরে তুমি

যতোই কেন মা, নিষ্ঠুর হও, তুমি যখন আমাদের মা, তখন এটুকু মহত্ত্ব বা মমতা—এ আমরা তোমারই কাছ থেকে পেয়েছি। বড়-দা যদি একদিন মা বলে ডেকে তোমার সামনে দাঁড়ান, তুমি তাঁকে এক নিমেষেই ক্ষমা করতে পারবে। আমাদের উনি কী বঞ্চিত করেছেন জানি না, আমাদের মা আছে—ওঁকেই আমরা বরং মায়ের থেকে এতোদিন বঞ্চিত করে রেখেছি। তোমার এই কোলের কাছে কী ঐ সম্পত্তি !

মাসিমা ধারালো বিদ্রূপ হানিলেন : ছেলেকে কী চমৎকার মানুষই করেছিস, রাজী !

রঙ্গলাল মা'র কোলে মাথা রাখিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। কহিল : তুমি যখন আছ, মা, তখন আমাদের মতো বড়োলোক আর কে আছে ? কোথাও তো কিছুর অভাব দেখছি না। কোনোখানেই তো ঠেকতে হচ্ছে না—

রাজলক্ষ্মী তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল : কিন্তু এই তো ঠেকতে হলো। পান্নাকে বিলেত পাঠাতে হবে বলে বিয়ে করতে চাচ্ছিস না।

রঙ্গলাল বলিল : তবে তুমি কি ভাবছ বড়-দা'র থেকে টাকা বাগিয়ে এনে পান্নাকে বিলেত পাঠাবার সব বন্দোবস্ত করতে পারলেই কালকে আমি বিয়ে করবো ? তা নয়, মা। বিয়ের এখনো দেরি আছে।

—কক্‌খনো না। দেরি আমি আর সইবো না, খোকা। পান্না

বিলেত যাক বা না যাক, ব্যাঙ্কে তোর টাকা জমুক বা না জমুক, বিয়ে তোকে এই অঘ্রানেই করতে হবে। কেবল খরচের ভয়! তোর বউ ক'হাঁড়ি ভাত খাবে শুনি? ঘাড়ে তো আর চোদ্দটা মাথা নিয়ে আসবে না যে চোদ্দ হাঁ করে ভাত গিলবে! রাজলক্ষ্মী রঙ্গলালের মাথাটা নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল: আমার কথা তোকে শুনতেই হবে।

—তা শুনবো। তবে আরো দু'টো বছর দেরি করলে ক্ষতি কী?

—দু'বছর! মাসিমা অবাক হইয়া কহিলেন: দু'দিন নয়, দু' মাস নয়—দুই বছর!

—দুই বছরে আমার মাইনে আরো বাড়বে, মাসিমা।

—আবার তোর সেই খরচের ভাবনা! রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া উঠিল: কী এমন তোর সৃষ্টিছাড়া বৌ আসবে যে তাকে নিয়ে টাকা-পয়সার হরির লুট দিতে হবে? মেয়ে আমি ঠিক করছি কিন্তু।

রঙ্গলাল কহিল: সেই মেয়েই যে আমার পক্ষে ঠিক হবে তা তুমি কী করে জানলে?

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া গেলো। কহিল: কী বললি? আমার পছন্দে তোর মন উঠবে না?

রঙ্গলাল লজ্জিত হইয়া কহিল: কিন্তু মা, বিয়ে তো আমাকেই করতে হবে। সারা জীবন যাকে নিয়ে থাকবো তার নির্বাচনের দায়িত্ব কি আমার ওপরে থাকাই সঙ্গত হবে না?

মাসিমা কহিলেন : তা, মেয়ে তোকে দেখানো হবে না নাকি ?

—শুধু দেখাতেই কী হবে।

—তবে আবার কী !

রঙ্গলাল হাসিয়া কহিল : তাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে, মাসিমা ! তার জন্যে আরো অনেক প্রতীক্ষা, অনেক তপস্যা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল : কেন, আমাদের পছন্দে তোর মন উঠবে না কেন ? তুই এমন কি ডানা-কাটা পরী চাস ? এখুনি তুই আমাদের অবিশ্বাস করতে শুরু করলি নাকি ?

রঙ্গলাল অসহিষ্ণু হইয়া কহিল : যাও, তোমাদের সঙ্গে আমি আর বাজে বকতে চাই না। আমাকে এখন ঘুমুতে দাও দিকি। যতো খুশি মেয়ে পছন্দ করো গে, বিয়ে আমি করছি না। বলিয়া সে তক্তাপোশে উঠিয়া শুইয়া পড়িল।

রাজলক্ষ্মী কহিল : তা করবি কেন ? মাকে কেবল খাটিয়ে মারবি। কই এখন হাত-পা ছড়িয়ে বসে সেবা পাবো, তা না, চরকির মতো কেবল আমাকে ঘুরে মরতে হচ্ছে !

মাসিমা বিছানার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন : কেন, কিসের জন্যে তোকে দেরি করতে হবে ? লেখা-পড়া শেষ হলো, দিব্যি চাকরি পেলি, বাসা করলি, দেরিটা কিসের শুনি ? বয়েসের একটা ছিরি আছে তো ?

রাজলক্ষ্মী দুই হাতে হতাশাসূচক এক ভঙ্গি করিয়া কহিল : ঐ

এক ওজর, পান্নাকে বিলেত পাঠাতে হবে। তা, বিয়ে করলে পান্নার বিলেত-যাওয়াটা কোনখানে বন্ধ হচ্ছে শুনি? যে-লোক বিষয়-আশয় ঠকিয়ে দিব্যি আত্মসাৎ করলে, তোরা যদি এমনিই ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে থাকিস, নাই বা তার সঙ্গে মামলা-ফয়সালা করলি। পান্নার জন্যে ব্যাঙ্কে টাকা তো জমাচ্ছিসই, আর বিলেতে সে কাল রাত পোহালেই যাচ্ছে না। এর মধ্যে ঘরে বউ আনতে কোন জায়গায় বাধছে শুনি? বউ এলে কি না খরচ বেড়ে যাবে! আমি কি তেমন উড়নচণ্ডি বাবু-বৌ আনবো নাকি ভেবেছিস? আর যাকে আমি আনবো তার সঙ্গে গুনে কম-সে-কম নগদ পাঁচটি হাজার টাকা। তাকে খাওয়াবার জন্যে দশটি বচ্ছর তোকে ভাবতে হবে না। বিয়ে করবে না! বিয়ে না করলেই হলো কি না!

দুই বোনে মিলিয়া আরো অনেকক্ষণ ধরিয়া গজগজ করিতে লাগিল ; রঙ্গলাল আর একটি কথাও উচ্চারণ করিল না।

চার

রঙ্গলাল যে এমন দৃঢ় অবিনয়ের সঙ্গে মায়ের আদেশ অমান্য করিবে ইহা রাজলক্ষ্মী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু কী যে ধনুকভাঙা পণ করিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে নোয়ানো গেলো না। হইলই বা না ছেলে, কিন্তু অম্লানমুখে পরাজয় স্বীকার করিবার ধাতই রাজলক্ষ্মীর নয়। সে রঙ্গলালের থেকে দূরে সরিতে আরম্ভ করিল।

রান্না আজকাল আর রাজলক্ষ্মী তদারক করে না, ঠাকুরের হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া সে এখন আবার তাহার হরি-নামের ঝুলি লইয়া বসিয়াছে। রান্না সম্বন্ধে রঙ্গলাল যদি কখনো নালিশ করিতে আসে, রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলে: আমি তার কী জানি? বিয়ে করতে পারিস না—বউ এসেই তো সব দেয়া-থোয়া দেখা-শুনো করতে পারে। আমি বিধবা মানুষ, আঁশের আঁকশালে গিয়ে রাতের বেলায়ও স্নান করি, না? মায়ের দুঃখ কি তোরা চোখ মেলে দেখতে পাস কোনো দিন? উঠিতে বসিতে রাজলক্ষ্মী অহর্নিশ এই জাতীয় খোঁটা দিয়া

চলিয়াছে। তাহাতে ধার দিয়া দিতেছেন মাসিমা। রাজলক্ষ্মী আজকাল নিজ হাতে তাহার বিছানাটা পর্যন্ত পাতিয়া রাখে না, চাকরের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই দিন খোট্রাটা তো তাহার টেবিল ঝাড়িতে গিয়া তাহার টাইম-পিস ঘড়িটাই ভাঙিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিল। তাই নিয়া রঙ্গলাল একটা হৈ-চৈ বাধাইতে যাইতেই রাজলক্ষ্মী বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল : ও তার কী জানে? কোন জিনিস কোথায় গুছিয়ে রাখতে হবে—ও কি ঐ ছাতুখোরের কাজ? ভাঙবেই তো—চাকর-বাকরের হাতে সংসার ছেড়ে দিলে যাবেই তো সব ছত্রখান হয়ে।

মা তাহার উপর সেই হইতে নিদারুণ অভিমান করিয়া আছে। হাত বাড়াইয়া ঘন করিয়া আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। আপিস হইতে যখন সে ফেরে, মা'র সমস্ত অবকাশ তখন এক নিমেষেই যেন নিঃশেষ হইয়া যায়, খাবারের থালাটা চাকরের হাত দিয়া পাঠাইয়া মাসিমা ও নলিনীর সঙ্গে ছাতে গিয়া প্রতিবেশিনীদের তুচ্ছ দৈনন্দিন কাহিনী শুনিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। রাত করিয়া তাহার মশারি তুলিয়া তাহার ঘুমের গম্ভীরতা নির্ণয় করিবার জন্য একবারো তাহার ঘরে আসে না। অন্তরঙ্গ হইবার সুযোগ সন্ধান করিবার আগেই ছল করিয়া কোনো কাজে হঠাৎ সরিয়া পড়ে। অসুখের ভান করিলে নির্লিপ্তের মতো কেবল বলে : তাহলে আজকে আর চান করিস নে, ঠাকুরকে না-হয় আটার রুটি করতে

বল, ভালো বুঝলে পান্নাকে একবার ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারিস। মাত্র এইটুকু। সেই উদ্বেগ-উদ্বেল স্নেহ-প্রাচুর্যে যেন হঠাৎ ভাটা পড়িয়া গেছে। সমস্ত ব্যাপারটায় রঙ্গলাল একটা মজা অনুভব করে। মা'র অভিমান-ম্লান বিষাদ-গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া সে মনে-মনে অস্থির হইয়া উঠে।

রঙ্গলাল ডাকে : মা ! ওমা ! শুনছ ?

রাজলক্ষ্মী বিরক্ত হইয়া বলে : কী, কেন ডাকছিস ? দেখছিস না আমি এখন মালা ফেরাচ্ছি।

মা'র এই কৃত্রিম ঈশ্বরাধনার ছলা-কলা দেখিলেই রঙ্গলাল বুঝিতে পারে মা তাহার নিকট হইতে কতো দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার রঙ্গলালের অস্তিত্ব হইতে কি-না ঐ কতোগুলি অর্থহীন নামের মোহ তাহার কাছে প্রবলতর হইয়া উঠিল !

তাহা ছাড়া আজকাল রাজলক্ষ্মী সময়ে-অসময়ে পান্নালালের ঘরে গিয়া তাহারই সঙ্গে অবসরযাপন করিতে শুরু করিয়াছে। তাহার পড়া নষ্ট হইবে বলিয়া সামান্যতম চিত্তবিক্ষেপের সুযোগ যে ঘটিতে দিতো না, সেই কি-না এখন উপযাচিকা হইয়া সেই ধ্যানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে।

রাজলক্ষ্মী বলে : ও না-হয় সন্নেসি হবে, কিন্তু তাই বলে তুই তোর ভাগ ছাড়বি কেন ?

পান্নালাল ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে-কাটিতে বলে : কিসের ঘোড়ার ডিমের ভাগ ! ডিনামিক্‌স্ নিয়ে যা হাঙ্গামায় পড়েছি

তার ওপরে আবার এই সিন্ধুবাদকে ঘাড়ে চাপাই আর কি!
—কিন্তু তুই বিলেত যাবি, তোর তো টাকার দরকার।
পেন্সিলের শিস্‌টা চোখা করিতে-করিতে পান্নালাল বলে: মেজ-দা'র যা কাণ্ড ওতে তুমি ঘাবড়িয়ো না, মা। কে যাচ্ছে? যারা ইউরোপ গেছে মা, তাদের মধ্যে কতো লোক যে এককেটি আস্ত গাধা হয়ে ফিরেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইউরোপ হচ্ছে ভারতবর্ষের কামাখ্যা—গেলেই সেখানে গাধা হয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে একেবারে অমানুষ হয়ে যায়। মেজ-দা'কে যেমন সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে—
—ও তো তোকে পাঠাবার জন্যে কোমর বেঁধেছে।
পান্নালাল মিনতি করিয়া বলে: তুমিই সে-যাত্রায় আমাকে বাঁচাতে পারো, মা। ঐ ম্লেচ্ছ দেশটার গুণপনা সম্বন্ধে সবিস্তার বিজ্ঞাপন দিয়ে যদি একটিবার গলা ফাটিয়ে কাঁদতে পারো, মা, তবে মেজ-দা গলে জল মেরে যাবে। মিছিমিছি আমাকে তাহলে আর ঐ অমানুষিক পরিশ্রমটা করতে হয় না।
রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া বলে: ওর কথায় আমি থাকতে যাবো কেন? ওর যা ইচ্ছে তাই করবে—আমার কী!
—তবে নিতান্তই আমাকে মহাদেশটা বেড়িয়ে আসতে হলো দেখছি। এমনিও অমানুষ, অমনিও অমানুষ। তার চেয়ে এই দিব্যি ছিলাম—খাও-দাও, টো-টো করে নির্ভাবনায় আড্ডা দাও, —দেশের একটা স্থায়ী উপকার হচ্ছিলো। অলস না থাকতে-

পারাটা যে কতো বড়ো ব্যাধি এ কোনো মহারথীরই মাথায় আসে না।

চারিদিকের সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া রঙ্গলাল মনে-মনে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিল। মা'র এই বিচ্ছেদ তাহাকে প্রতি মুহূর্তে গভীরতর ক্লান্তির মধ্যে লইয়া আসিতেছে। সামান্য তো একটা বিয়ে—দুইটি দিন-রাত্রির অবসানের পর পৃথিবীর যে-ঘটনাগুলির আর কোনো পারস্পরিক তারতম্য নাই—মা'র সন্তোষের জন্য তাহার প্রতিজ্ঞাকে সে এইটুকু শিথিল করিতে পারিবে না? জীবনে সে এতোদিন ধরিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে? কবে সে আসিবে—তাহার এই হৃদয়ের গহন-দুর্গম পথ সে চিনিবেই বা কী করিয়া? অনির্বাণ আলো না-হয় সে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই আলোতে পথ চিনিয়া সে-ই যে ঠিক আসিবে তাহার প্রমাণ কী? বিবাহ তো সে করিতই, তবে—হ্যাঁ, যাক, আর কথা নয়, বিয়ে যখন সে করিতই, তখন মাকে খুশি করিতে আগামী বৈশাখেই সে করিয়া ফেলুক না! অনেকে—অনেকেই তাহার মতো দীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রতীক্ষা করিয়াছে—বৃথা; সে আসে নাই, সে কখনো, কাহারো জীবনে আসে না; আর যদি সে আসেও, দুইদিন পরেই মনে হইয়াছে, এ সে নয়। অসীম সময়-সমুদ্র মন্থন করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে না। তবে মাকে বেশিদিন অতৃপ্ত ও অসুখী রাখিয়া লাভ কী!

অতএব রঙ্গলালকেও তাহার প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিকে হ্রস্ব ও

সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতে হইল। রঙ্গলাল কহিল : বেশ, পুরুত ঠাকুরকে ডাকিয়ে বৈশাখে দিন ঠিক করে ফেলো মা। আর আমি আপত্তি করবো না।

রাজলক্ষ্মী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রঙ্গলালকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল : এতো দিন রোজ সহস্রবার করে নাম জপ করবার ফল তাহলে পেলাম দিদি।

আনন্দে মাসিমা তো উলুই দিয়া ফেলিলেন।

নলিনী দাঁত দিয়া আঁচলের খুঁট চিবাইতে-চিবাইতে কহিল : মেজ-মামার সেই বিয়ে করার পুরো ষোলোআনাই শখ ছিলো, দিদিমা, মাঝে থেকে একটুখানি ন্যাকামো করে নিলো।

রাজলক্ষ্মী উদ্ব্যস্ত হইয়া কহিল : মেয়ে তো আমার পছন্দই আছে, একবার পুরুত-ঠাকুরকে ডাকা। না, মহেন্দ্রবাবুদের সঙ্গে আগে পাকাপাকি একটা 'পান-পত্র' করে নিতে হবে? কী করতে হবে এখন, শিগগির বলো না, দিদি। পরামর্শ দাও।

রঙ্গলাল কহিল : তবে এক কথা, মা। ঐ মহেন্দ্রবাবুর মেয়েকে নয়।

—কেন? ঐ মেয়েকে তুই দেখেছিস?

নলিনী মুখ ঘুরাইয়া কহিল : একেবারে জলজ্যান্ত অপ্সরা, মামা।

রঙ্গলাল গম্ভীর হইয়া কহিল : তা হোক। কিন্তু বিয়েতে আমি টাকা নিতে পারবো না।

রাজলক্ষ্মী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল : চাইলেই যখন পাওয়া যায়,

তখন নেব না কেন ? তারা খুশি মনেই তো দেবে—জুলুম তো কেউ করতে যাচ্ছে না।

—দিলেও বা। ও আমি পারবো না ছুঁতে।

মাসিমা কহিলেন : তোর ব্যবসা-বুদ্ধি চিরকাল কাঁচাই থেকে গেলো—লেখা-পড়া শিখে মানুষ তো না একটা পাঁঠা হয়েছিস। এতো বড়োলোক শ্বশুর হবে—সুন্দরী বউ—

রাজলক্ষ্মী কঠিন গলায় কহিল : কিন্তু বরপণ বলে যদি নগদ কিছু ধরে না দেয়, তাহলে তো আর আপত্তি নেই ?

—তাহলেও আপত্তি আছে। রঙ্গলাল স্পষ্ট, সতেজ ভঙ্গিতে বলিল : বড়োলোকের ধার দিয়েই আমি যাবো না। বিয়ে যখন একটা করতেই হবে—আর, সব বিয়েই যখন সর্বসাকুল্যে এক—আমি কোনো এক দুঃস্থ, গরিব গৃহস্থেরই উপকার করবো। শরীরের সংজ্ঞায় যে রূপসী নয়, ধরো যার অর্থের অভাবে ভালো পাত্র মিলছে না—কিম্বা ধরো, যে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সমাজের বুকে পাথর হয়ে বসে আছে।

চক্ষু কপালে তুলিয়া মাসিমা বলিলেন : তুই পাগল হলি নাকি, খোকা ?

রাজলক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া বলিল : এমনি করে তুই আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাস নাকি ? থাক তোর বিয়ে, কার এমন মাথা-ব্যথা পড়েছে ?

রঙ্গলাল আর্দ্র হইয়া কহিল : তোমার ওপর কিসের প্রতিশোধ

নিতে যাবো, মা ? এ তো একটা এক মুহূর্তের কাণ্ড নয় যে একটা ছেলেখেলা করে তোমার সঙ্গে একটু ঝগড়া করে নিলাম। দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ আমার, সারা জীবন এর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে আমাকেই। তোমরা কোথায় ? তোমরা তো আমার আগেই সরে পড়বে বোধহয়। না মা, এ-ক্ষেত্রে মাথা-ব্যথা কেবল আমারই। বিয়ে যখন করবোই, তখন তাতে যদি কারো কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক উপকার হয়, তো মন্দ কী ! আরো তো অনেক সম্বন্ধ উপস্থিত আছে—ভেবে-চিন্তে একটা ঠিক করলেই চলবে। বলিয়া সে নিচে চলিয়া গেলো।

রাজলক্ষ্মী কহিল : এমন সর্বনেশে বিদ্‌ঘুটে কথা কেউ কখনো শুনেছে ? রূপে-গুণে আমার এমন রাজপুত্তুরের মতো ছেলে—সে কিনা বিয়ে করবে একটা পেঁচি-খেঁদিকে ?

দিদি বলিলেন : ওর ও-সব রঙ্গে তুই কান দিস নে, রাজী। গোটা কতক পছন্দসই মেয়ে দেখা না, কাকে বিয়ে করতে হবে ঠিক ওর চোখ খুলে যাবে দেখিস। এখন আর তা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিস নে, কোনো রকমে একবার যখন বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, তখন কোথাও আর বাধবে না।

পাঁচ

রঙ্গলাল মা'র নির্দেশ মতো পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অতিমাত্রায় অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্তিকর বোধ হইতেছে। এমনি শরীরময় নৈকট্যের মাঝে সে তাহার প্রিয়তমার আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারিত না—তাহাকে পাইবার ইহাই প্রশস্ত, অবারিত, সহজ রাজপথ ছিলো না। তাহাকে সে পাইবে ভাবিয়াছিল গভীর বিরহের মধ্যে, প্রশান্ত প্রগাঢ় প্রতীক্ষায়—অনেক দূর-দুর্গম বাধা-বন্ধুর কণ্টকাস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া। সে যে যৌবনে কতো দৃপ্ত, কতো অমিতপরাক্রমময় তাহাই সে নিজের কাছে উদঘাটিত করিতে চাহিয়াছিল। প্রিয়তমাকে সে পাইত কি না জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে তাহার প্রেমকে হয়তো অবিনশ্বর করিয়া রাখিত।

রঙ্গলালের জীবনেও সেই সুযোগ আর আসিল না। প্রতীক্ষার যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের কোলাহল শুরু হইয়াছে। মহত্তর স্বার্থপরতার চেয়ে পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত শান্তি অনেক কামনীয়। জীবনের সেই দুর্দম আরণ্য উন্মাদনার পরিবর্তে সে চায়

এখন সামাজিক সামঞ্জস্য, শারীরিক সঙ্কীর্ণতা—তাহা অনেক সহজ, অনেক স্বাস্থ্যকর। একটি মুহূর্তের কোটিতম ভগ্নাংশের জন্যও সে সজীব মৃত্যুর শিহরণ না-ই বা অনুভব করিল, দেহের আধারে কোনো রকমে স্বল্পসুখী প্রাণ বহন করিতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যাইবে। পরীক্ষার রোমাঞ্চ ছাড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তেই সে এক ধাপে উত্তীর্ণ হইল। আর, আগাগোড়া যখন প্রয়োজনের কথাই উঠিতেছে, তখন সে বরং দুর্গতত্রাণ করুক—নিজের সেই অসীম-দুঃখময় বিপুল আনন্দের দিকেই যখন সে চাহিল না, যখন নিতান্ত একটা সামাজিক অনুষ্ঠানই সে পালন করিতেছে, তখন তাহাতে কোথাও না কোথাও এই সমাজের উপকার হোক।

অবশেষে যে-মেয়েটিকে সে পছন্দ করিল তাহাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিতে কালো তো সে বটেই, বাপের অবস্থাও তেমনি কদর্য। বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ কোন সওদাগরি আপিসে সামান্য মাহিয়ানায় কাজ করেন, কালো মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হইবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিয়াই মেয়েকে বেশি বয়সে ইস্কুলে দিয়াছিলেন। কৃত্রিম বিদ্যা ও তাহার আনুষঙ্গিক অঙ্গসজ্জায় মেয়ের স্বাভাবিক বর্ণদীনতার কিছু ক্ষতিপুরণ হইতে পারে বা। আভা এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করিয়াছে ও মেয়েদের মধ্যে যা-হোক একটা বৃত্তি পাওয়ার দরুনই তাহার কলেজে-পড়াটা খানিক সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবে খরচের দায় হইতে রাজেন্দ্রবাবু অতি-সহসা মুক্ত হইতে

পারিবেন তাহা তাঁহার স্বপ্নের অতীত ছিলো। একটি পয়সা তো ব্যয় করিতে হইবেই না, বরং এমন উপযুক্ত, উপার্জ্জনক্ষম জামাই হইলে কখনো-সখনো তাঁহারো ব্যক্তিগত অভাবের তালিকাটা সংক্ষিপ্ত হইতে পারিবে।

ঐ কালো, ঢ্যাঙা, কৈশোরোত্তীর্ণা মেয়ের মধ্যে রঙ্গলাল যে কী দেখিয়া মুগ্ধ হইল রাজলক্ষ্মী কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। রঙ্গলাল তো আগাগোড়াই তাহার অবাধ্যতা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বিদ্রোহ এমন নির্ম্মম হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত! বরপণ নিবে না, না নিক, কিন্তু গরিবের ঘরে ইহার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কি কোনো কালে জন্মগ্রহণ করে নাই? লেখাপড়া করিতে গিয়া মুখশ্রী তো নিতান্ত রুক্ষ, বিরস হইয়া উঠিয়াছে— আর, বাকি জীবনটা কোলে বই লইয়া বসিয়া কাটাইয়া দিবে বলিয়াই কি তাহার বিবাহ হইতেছে নাকি? ঐ মেয়ের কল্যাণে তাহার ভাবী-পৌত্রী-পৌত্রাদির চেহারার কথা কল্পনা করিয়া রাজলক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল—তাহারা 'জলচল' কি না চেহারা দেখিয়া হয়তো সে নিজেই একদিন সন্দেহ করিয়া বসিবে। তাহার এতো সাধের, এতো সাধনার রঙ্গলাল—যাহাকে সে পৃথিবীর অগ্রগামীদের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল—তাহার কি না এই দুর্গতি! কোথায় সে পুত্রবধূকে নিয়া সমস্ত দেশময় গর্ব করিয়া বেড়াইবে, তাহার আগমনে নূতন ঐশ্বর্যের পত্তন করিবে— তাহা না হইয়া এখন হইতে কি না তাহাকেই মুখ লুকাইয়া

থাকিতে হইল! রাজলক্ষ্মীর মনে হাসি-কান্না মিলাইয়া কতো সব স্বপ্নের রামধনু জাগিত, আজ রূঢ় জাগ্রত রৌদ্রে তাহারা একে-একে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলো। ছয়ছোট্ট কিশোরী একটি বৌ আসিবে—কোরকের মতো অস্ফুট ও অনাঘ্রাত—এবং দিনের পর দিন রাজলক্ষ্মীরই স্নেহে ও শাসনে, বৃষ্টিতে ও উত্তাপে সে বিকশিত হইতে থাকিবে। তাহাকে আর পুত্রবধূর ওপর কর্তৃত্বময় প্রাধান্য বিস্তার করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। সে একেবারে স্বয়ং-প্রধান, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াই আবির্ভূত হইল। ছি, ছি, রাজলক্ষ্মী কী করিয়া তাহার এই প্রাধান্য-হীনতার দুঃখ সহিবে?

কিন্তু রঙ্গলাল কিছুতেই নরম হইল না—স্তুতি মিনতি সব ব্যর্থ হইল। হোক সে কুরূপা, সাধারণ নিয়মে সে কুরূপা বলিয়াই তো তাহাকে সে জীবনে এই সগৌরব প্রতিষ্ঠা দিবে! মা'র কিছু ভয় বা চিন্তা করিবার নাই—এই মেয়েটিকেই তাহার ভালো লাগিয়াছে—তাহার রুচি যদি অধঃপতিত হয়, তবে তাহার জন্য নিজেকেই সে একা দায়ী করিতে পারিবে। আর রঙ্গলাল যদি মা'র ছেলে হয়, তবে তাহার স্ত্রীও যে নিশ্চিত তাহার অনুবর্তী হইবে—রঙ্গলাল রাজলক্ষ্মীকে এই ভরসা দিলো। বলিল : একেই যখন আমার মনে ধরলো, মা, তখন একেই তোমাকে সানন্দে আশীর্বাদ করতে হবে। আমি যদি একে নিয়েই সুখী হবো মনে করে থাকি, তবে সেই ভুল ভাঙবার স্বাধীনতাও আমাকে দাও।

রাজলক্ষ্মী প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল : কিন্তু রাজ্যে আর মেয়ে

ছিলো না? তাই বলে এই কেলে পেত্নিকে তোর বিয়ে করতে হবে? এতো সব মেয়ে দেখালাম, তাদের একটাকেও তোর মনে ধরলো না? বাপ তো সাক্ষাৎ একটা চামার—যেমন হাল তেমনি হায়া! আর মেয়েরই বা কী ছুরৎ—কুঁজো, রোগা, ঝাঁটার কাঠির মতো চেহারা—

রঙ্গলাল হাসিয়া বলিল: তাকে ঘরে আনবার আগে যা-খুশি বলে নাও, কিন্তু এসে পড়লে তার মুখের ওপর তো এই মোলায়েম কথাগুলো বলতে পারবে না।

—কেন পারবো না? তোর বউ বলে ছেড়ে কথা কইবো নাকি?

—নেহাৎ আমারই তো বউ, মা। তোমার রঙ্গলালের।

মাসিমা টিপ্পনি কাটিতে ছাড়িলেন না: বিয়ে না করতেই যে এতো মায়া! দেখিস। কী জাদুই যে তোকে করেছে—

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া বলিয়া উঠিল: আমার কপাল দিদি, কপাল! কী যে একখানা পছন্দ!

আভার রঙ ময়লা বটে, কিন্তু মা'র ঐ গ্রাম্য বিশেষণগুলিই রঙ্গলাল আপন কল্পনায় পরিচ্ছন্ন করিয়া লইল। কৃশ, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি—মুখখানি লাবণ্যে উদ্ভাসিত! কালো মেয়ের যে এতো রূপ থাকিতে পারে তাহা দেখিবার চক্ষু সংসারে খুব অল্প লোকেরই আছে ভাবিয়া রঙ্গলাল আশ্বস্ত হইল। একমাত্র বর্ণই যদি রূপনির্ণেতা হইত, তাহা হইলে পশ্চিমের তুষারগাত্রীরা এমন কুৎসিত মুখ করিয়া থাকিত না। রঙ্গলালের মনে হয়, সর্বসমেত

রূপ হইতেছে আবির্ভাবে, তাহার প্রথম আত্মোদ্ঘাটনে। সেই দিক দিয়া আভার তুলনা নাই। দুই বিশাল চক্ষুর গভীর দীপ্তিতে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব-চেতনা জ্যোতিষ্মান হইয়া আছে। কাহারো মাত্র দৈহিক উপস্থিতিতেই এমন প্রবল উজ্জ্বলতা থাকিতে পারে রঙ্গলাল অন্যান্য পাত্রী দেখিয়া তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সমস্ত দেহ যেন সবল প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া আছে, ভঙ্গিতে একটি অনায়াস ও অচপল দৃঢ়তা। সে যে গরীব তাহাতে তাহার এতোটুকু দুঃখ নাই—তাহার রঙ যে কালো তাহা তাহার জীবনের পক্ষে অনপনেয় লজ্জা নয়, তাহাকে যে সম্প্রতি নিতান্তই সমাজের প্রথা পালন করিয়া বুভুক্ষুদৃষ্টি পুরুষের সামনে উপস্থিত হইতে হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহার হঠকারী, অশোভন বিদ্রোহ নাই—এমন দৃপ্ত, অকুণ্ঠিত, তেজোময় আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্যে রঙ্গলাল মুগ্ধ হইয়া গেলো। ভঙ্গি জড়িমাশূন্য, উচ্চারণগুলি স্পষ্ট, নিরহঙ্কার দৃষ্টিতে প্রতিভার দীপ্তি পড়িয়াছে। বিধাতা তাহাকে যে কৃত্রিম, বাহ্যিক, চর্মসর্বস্ব সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহার ক্ষতি সে আপন অস্তিত্ববোধের তেজে পূর্ণ করিয়া নিয়াছে। সেই সৌন্দর্য তাহার অবয়বের সীমায় আবদ্ধ হয় নাই, সেই সৌন্দর্য তাহার ভঙ্গিতে, তাহার চেতনায়, তাহার জাগ্রত, বুদ্ধি-উদ্দীপ্ত প্রতিজ্ঞায়! রঙ্গলালের মতোই সে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর আদর্শের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে—সেই বহুদূরসন্ধিৎসু

প্রতিভার আলো আভারো চোখে জ্বলিতে দেখিয়া তাহার মনে সহসা ডাক দিয়া উঠিল। সে এমনই একটি মেয়েকে খুঁজিতেছিল —আপন অন্তরের সম্পদে যে জীবনের পূর্ণতা খোঁজে, জীবনের পূর্ণতা সম্বন্ধে যাহার ঔদার্যময়, বলিষ্ঠ একটা অভিমত আছে। হয়তো এই সেই মেয়ে।

রাজলক্ষ্মীর স্বপ্নের সঙ্গে রঙ্গলালের আদর্শের সংঘর্ষ বাধিল, কিন্তু কিছুতেই রঙ্গলাল হার মানিল না। আভার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেলো। তাহাকে রাজলক্ষ্মী বিবাহই বা বলে কী করিয়া? কোথায় সেই আত্মীয়-সমাগম, সেই উৎসব-সভা, বরপক্ষীয়দের সেই সাহঙ্কার আস্ফালন! কী নিয়া রাজলক্ষ্মী উৎসব করিবে, তাহার এই নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের শূন্যতার মাঝে কাহাকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে? মাত্র পান্নালাল ও জনকয়েক বন্ধু-বরযাত্রী লইয়া রঙ্গলাল বিবাহ করিতে গেলো; তাহাকে প্রণাম করিবার সময় মাথায় ধান-দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ সে একটা করিল বটে, কিন্তু চোখের জলও চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ছেলে হইয়া রঙ্গলাল তাহাকে যে গভীর বঞ্চনা করিল তাহা সে কী করিয়া সহ্য করিবে? এই অবহেলা, এই আঘাত পাইবার জন্যই সে তাহাকে এতো দুঃখে লালন করিয়া এতো বড়ো করিয়াছে। আঁচলের আড়ালে যে মৃদু দীপশিখাটিকে সে এতো বিনিদ্র রাত্রি জাগিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে আজ কি না আপন ঔজ্জ্বল্যে তাহাকেই দগ্ধ করিয়া দিলো।

তাহার পরে বউ লইয়া রঙ্গলাল যখন নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিল—তাহার সামান্য বেড়াইয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার সময়ও ইহার চেয়ে বেশি শোরগোল হয়—তখন রাজলক্ষ্মী দস্তুরমতো শোকশয্যা নিয়াছে। খবরটা সে পান্নালালের কাছ হইতে আগেই পাইয়াছিল—দানসামগ্রী বলিতে কয়েকটা ঠন্‌ঠনে বাসন, আর মেঝেতে শুইবার জন্য পাটির উপর একটা খেলো বিছানা। বরযাত্রীদের ভালো করিয়া খাওয়ায় নাই পর্যন্ত। এই ভাবে তাহার রঙ্গলালের বিবাহ হইয়া গেলো।

নিচে সহসা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া গাঁটছড়া খুলিয়া আভাকে লইয়া রঙ্গলাল উপরে উঠিয়া আসিল। প্রথমে দেখা হইল নলিনীর সঙ্গে। নলিনী উল্লাসে উলু দিয়া উঠিল। মাসিমা বাহির হইয়া আসিলেন। কিন্তু মা কোথায়?

আভাকে লইয়া রঙ্গলাল মা'র ঘরে ঢুকিল—ঘরটা অন্ধকার, এক কোণে মেঝের উপর রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। সুইচ টানিয়া রঙ্গলাল আলো জ্বালাইল; ম্লানকণ্ঠে কহিল: আমরা এলাম, মা, আর তুমি কি না চুপ করে অন্ধকারে পড়ে আছো? এ কী, তোমার অসুখ করেছে নাকি?

রাজলক্ষ্মী শূন্যচক্ষে ছেলের দিকে একবার তাকাইল, একটিও কথা কহিল না।

রঙ্গলাল বলিল: ওঠো, তোমাকে প্রণাম করি, আমাদের

আশীর্বাদ করবে না? বলিয়া সে আভাকে সঙ্কেত করিল: এই আমাদের মা।

মাসিমা বলিলেন: আর মুখ ভার করে থেকে কী করবি? ছেলে যখন কাণ্ড একটা করেই বসেছে, তুই তো তাই বলে ওদের ফেলতে পারবি না।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া বসিল। রঙ্গলাল প্রণাম করিল। আভাও দেখাদেখি শাশুড়িকে প্রণাম করিতে নত হইল, রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল: থাক, থাক, বিদ্যের জাহাজ তোমরা—মুখখু-সুখখুর কাছে মাথা নোয়াবে কী?

আভা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঙ্গলাল কহিল: আর ইনিই আমার মাসিমা।

আভা অতি ভয়ে-ভয়ে মাসিমার পায়ের কাছে বসিল। প্রণাম সাঙ্গ হইলে মাসিমা কহিলেন: দান-সামগ্রী, টাকা-কড়ি না-হয় কিছু না দিলো, তাই বলে মেয়েকে দু'চারখানা ভালো গয়না দিতে কী হয়েছিলো? সরু দু'গাছ চুড়ি, আর এক সুতো হার! বেয়াইর চোখে কি চামড়া নেই?

রাজলক্ষ্মী তীব্রস্বরে কহিল: চামার! চামার!

সহসা রঙ্গলালের চোখ-কান জ্বালা করিয়া উঠিল, তবু গলার ঝাঁজ দমন করিয়া সে কহিল: ছি, মা, ও নতুন এই বাড়িতে এসে সবে পা দিলো, ওকে লক্ষ্য করে ওর বাবাকে গাল দেওয়াটা কি ভালো দেখায়?

রাজলক্ষ্মী কুটিল মুখভঙ্গি করিয়া কহিল : দেখলে, দেখলে দিদি, ও এরি মধ্যে বউর হয়ে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছে!

রঙ্গলাল কহিল : না, আমাদের হয়েই বলতে চাচ্ছি। আমাদের তবে ও কী ভাববে?

মাসিমা কহিলেন : কী আবার ভাববে! এমন জামাই পেলো— ওদের চোদ্দগুষ্টির ভাগ্যি। তাই বলে মেয়েকে এক সেট ভালো গয়না দিতে পারতো না? কী ভালো দেখায় না-দেখায় গুরুজনদের তোর তা শেখাতে হবে না।

রঙ্গলাল কহিল : কোত্থেকে দেবে বলো? অবস্থা তো ওদের জানো। এই নলিনী ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর মামিমাকে নিয়ে যা, ভাব কর তার সঙ্গে।

নলিনী আসিয়া আভার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলে রঙ্গলাল ঢোঁক গিলিয়া কহিল : দু'খানা গয়নায় কী আর আমাদের সম্পদ বাড়তো, মা? তুমিই তো বলতে, মেয়েমানুষের ঐশ্বর্য তাদের বাইরের আভরণে নয়, তাদের অন্তরের দীপ্তিতে। সে-কথা তুমি এর বেলায়ই বা খাটাতে চাইবে না কেন?

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট উলটাইয়া কহিল : আহা, কী এঁর দীপ্তি!

রঙ্গলাল বলিল : বেশ তো, যদি বলো, আমিই গয়না গড়িয়ে দিতে পারবো, তাতে কী?

—তা দিবি না? কতো দিবি। আমার বলতে হবে কেন? আমি তোর কে?

মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রঙ্গলাল কহিল : তুমি আমার কে, এ-কথা এতো দিন পরে আমার নতুন করে জানতে হবে নাকি, মা ? তুমি আমার সব কিছুর চেয়ে বড়ো, সকল স্থানের উর্ধ্বে তোমার স্থান। কিন্তু মা, আমার সুখের চাইতে তুচ্ছ ক'টা জিনিসের দাম তোমার কাছে বেশি হলো ? আমি যদি সত্যিই সুখী হই, তবে ওর রঙ কালো বা ওর বাবার অবস্থা খারাপ, তাতে কী বলো এসে যায় ? সংসারে আমি সুখী হলেই কি তুমি সুখী হও না ?

—কিন্তু তাই বলে তুই এই প্যাঁচামুখীকে পছন্দ করলি কী বলে ?

রঙ্গলাল হাসিয়া কহিল : অন্য মায়েরা যে তোমার ছেলেকে ভাল্লুক-মুখো বলে ! মুখে হলে কী হয়, স্বভাবে না হলেই হলো। কী বলো মাসিমা ! নতুন ও এলো, তোমরা সব ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও। আমার বন্ধুরা আজ এখানে খাবে—কিছুই যোগাড় দেখছি না যে·। পান্না গেলো কোথায় ?

ছয়

দেখিতে দেখিতে সব ভোল ফিরিতে শুরু করিল।

রঙ্গলালের সেই সব ময়লা জামা-কাপড় কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, ঘরে-দুয়ারে কোথাও আর এতোটুকু অযত্নসমৃদ্ধ অপরিচ্ছন্নতা নাই—আভার স্পর্শে রঙ্গলালের পোশাকে ও গৃহে ভোগবিরতির সেই রুক্ষতা হঠাৎ অপসৃত হইয়া গেলো। চতুর্দিকে শ্রীর বন্যা নামিয়াছে। রঙ্গলাল চুল চকচকে করিয়া সিঁথি কাটে, মাটিতে দিশি ধুতির কোঁচা লুটাইয়া চলে, সিল্ক ছাড়া জামা পরে না। ঘরেও আজকাল একে-একে দামি-দামি আসবাব আসিতেছে—একটা ড্রেসিং টেবিল, বেতের ইজি-চেয়ার, বই রাখিবার শেলফ্। এখন তাহার আরো একটা ঘর দরকার - নিচের সেই পরিত্যক্ত ঘরটায় সে আজকাল বসে, পড়াশুনা করে, বন্ধুরা আসিয়া জুটিলে আড্ডা দেয়। রাজলক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া বলে: ছেলের আমার মূর্তিখানা দেখ, দিদি। তখন কতো পই-পই করে বলতাম, ভালো দু'খানা কাপড় পরবারো কোনোদিন চাড় হয়নি। আর এখন বউ এসেছে, সাজ-গোজের একবার ঘটা দেখ।

দিদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন : আজকালকার হাওয়াই ঐ। বউ পেয়েই ছেলেগুলো যেন কী হতে থাকে! মা-মাসির দিকে ফিরে চাইবারো আর নাম নাই।

নলিনী চোখ বড়ো করিয়া নাকের বাঁশি ফুলাইয়া জোরে নিশ্বাস নিতে-নিতে বলে : মেজ-মামির চুল বাঁধবার জন্যে সেই আয়নাওলা টেবিল কিনে দিয়েছে, দেখেছ ছোড়দিদিমা? কতো রকম সব স্নো, পাউডার, মুখে লাগাবার জন্যে লোম-ওলা ফুল— মেজ-মামি তো দিনের মধ্যে দশবার গালে-মুখে পাউডার ঘষে— কিন্তু রঙ তো দেখি বদলায় না। আর আমি যদি একটু আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তো কী কটমট করে যে তাকায়, আমি যেন ওর আয়না চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো। আর স্নোর শিশিতে যদি হাত দিই কোনোদিন, তবে তো মামা আমাকে মেরেই ফেলবে।

রাজলক্ষ্মী বলে : য়্যাদ্দুর?

নলিনী বলিতে থাকে : তারপর শোন, সেই দুটো লম্বা হয়ে শোবার চেয়ার কিনেছে না, চাকরকে দিয়ে সেই দুটো চেয়ার ছাতে নিয়ে গেছে। তোমরা তো তখন ঘুমিয়ে, রাত করে দুজনে ছাতে উঠে গেলো। লুকিয়ে-লুকিয়ে আমিও গেলাম, দেখি দুজনে চেয়ারে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। তারপর মামিমার জন্যে কতো বই কিনেছে দেখনি বুঝি? তাই রোজ রাত জেগে-জেগে পড়ানো হয়।

শাশুড়িকে তাহাদের শোয়ার ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া আভা

সন্ত্রস্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার না-জানি সে নতুন করিয়া কী অপরাধ করিয়াছে! স্বামীর সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতার দিনে রঙ্গলাল আভাকে বলিয়া দিয়াছিল: মা'র কোনো কথায়ই তুমি কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু, নির্বিচারে তাঁর সমস্ত আদেশ, সমস্ত শাসনই মাথা পেতে নেবে। পারবে না? আমিই তো তোমার আছি, আর আমি যখন তোমার পক্ষে, তখন কোনো দুঃখ কোনো অপমানই তোমাকে স্পর্শ করা উচিত নয়। মা'র প্রতি তোমার এই অকাতর বশ্যতা থেকেই আমি প্রমাণ পাবো আভা, সত্যি তুমি আমাকে কতোখানি ভালোবাস।

সেই হইতেই আভা শাশুড়িকে পদবীর অতিরিক্ত সম্মান দেখায়, কিসে তাহার মন পাওয়া যাইবে অহর্নিশ তাহারই কেবল পথ খোঁজে, শত লাঞ্ছনা ও বাক্যযন্ত্রণায়ও সে মুখ তোলে না। একেক সময় এই শানিত, উলঙ্গ অন্যায় ও রূঢ়তার বিরুদ্ধে সে ফণা তুলিতে চায়—আত্মদমন করা অসহ্য হইয়া উঠে, কিন্তু স্বামীর কথা মনে করিয়া অসংযমী জিহ্বাকে নিরস্ত করে। তাহার স্বামীই তো আছে, স্নেহসিক্ত একটি স্পর্শে ও কথায়, তাহার বিশ্বব্যাপী, বলিষ্ঠ বন্ধুতায় সমস্ত জ্বালা তাহার জুড়াইয়া যায়। স্বামীকে যে সে কতো ভালোবাসে, নীরবে সমস্ত উপদ্রব ও অপমান সহ্য করিয়া তাহা সপ্রমাণ করার জন্য আভা ব্যস্ত হইয়া উঠে।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়াই একেবারে ফাটিয়া পড়িল: দিনের মধ্যে তো পঁচিশ বার হাতে-মুখে 'সোনো' ঘষছ, যেই কেলে সেই কেলেই

তো থেকে গেলে—তবু লজ্জা বলে তো কোনো বালাই দেখছি না। আর এদিকে নলিনী ওতে একটু হাত দিতে এলে অমন তেড়ে আসো কেন? বউরা বাপের বাড়ি থেকে কতো সব সাবান-তেল, কাঁটা-ফিতে নিয়ে আসে, ননদ-ভাগ্নিদের বিলিয়ে দেয়—তার তো নাম নেইই, সোয়ামি যা শখ করে কিনে দিয়েছে তা থেকে ওকে একটু দিলে তোমার কী এমন একেবারে সর্বনাশ হয়ে যায় শুনি? লেখাপড়া শিখেছ বলে ছেলে তো আমার খুব বড়াই করে—কিন্তু এমন ছোটো নজর কেন? হবে না—যেমন ঝাড়, তেমনি তো ফল গজাবে!

কথা শুনিয়া আভার সমস্ত গা-হাত-পা ঝাঁজিয়া উঠিল; তবু কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত রাখিয়াই কহিল: নলিনী আপনাকে তাই বলেছে?

—না, ও বলবে কেন, আমি গায়ে পড়ে মিথ্যে কথা বলতে এসেছি? তোমার যে বড়ো তেজ হয়েছে, ভেড়ার মতো সোয়ামি পেয়ে বড্ড বেড়ে গেছ দেখছি—আমাকে তুমি মিথ্যুক বলো?

দুঃখে বিমর্ষ হইয়া আভা কহিল: ছি, অমন কথা আমি মনেও স্থান দিইনি, মা। আমি বলছিলাম, নলিনী ও-কথা আপনাকে বললো কী করে?

রাজলক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া বলিল: এখনো আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না? এতো হেনস্তা। তবে নলিনীকে ডেকে তোমার সামনে মোকাবিলা করে দিতে হবে?

তেমনি শান্তস্বরে নতদৃষ্টিতেই আভা কহিল : সে যখন একবার ও-কথা বলেছে, তখন ডেকে আনলেও তাই বলবে। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবেন কি-না জানি না, সত্য কথা ও মোটেই বলেনি। যখনই ওর চুল বেঁধে দিই, মুখ পরিষ্কার করে স্নো ঘষে পাউডার মেখে দি। তা ছাড়া আমার জিনিসের যখন যা ওর দরকার হয়েছে, কোনো দিন 'না' বলিনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল : তুমি যেমন দৃষ্টিকৃপণের মেয়ে, হয়তো আঙুলের ডগায় করে দু'এক ফোঁটা লাগিয়ে দাও মাত্র।

আভা সামান্য তপ্ত হইয়া বলিল : তবে স্নো কতগুলি করে মাখতে হয় ?

রাজলক্ষ্মী আবার চিৎকার করিয়া উঠিল : মুখে-মুখে ঐ সকল তর্কই করতে জানো, আর সংসারের মধ্যে চিনেছ কেবল এক সোয়ামিকে। ভারি মেম-সাহেব হয়েছ, না ? তবু এতো এতো করে স্নো মেখেও তো ছুরৎ ফেরে না দেখি।

সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিয়াই রঙ্গলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া নেয়। আভা আসার পর হইতে রাজলক্ষ্মী রান্নার তদারক করিতে আর নিচে নামে না, তাই আভাও কোনো-কোনো দিন সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া স্বামীরই সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া পড়ে। পান্নালাল সম্প্রতি সাহিত্যিক মহলে আড্ডা দিতেছে বলিয়া ফিরিতে তাহার একটু রাত হইয়া যায়। ঠাকুর তাহার ভাত ঢাকিয়া রাখে।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে দরজা ভেজাইয়া আভা বিছানায় তাহার

বই-খাতা ছড়াইয়া রঙ্গলালের পাশে শুইয়া পড়ে, বুকের তলায় বালিশ রাখিয়া পড়িবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ ও সহিষ্ণু করিয়া নেয়। রঙ্গলাল তাহার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকসংক্রান্ত অনেক আলাপ-আলোচনা করে ও যতোক্ষণ পড়া বলিয়া দেয়, ততোক্ষণ অন্ততঃ সে শিক্ষকের একটা দূরত্ব রাখে; তারপর নির্জীব বই-খাতাগুলি যখন একে-একে বিছানা হইতে তিরোধান করিয়া ব্যবধানকে সংকীর্ণতর করিয়া আনে, তখন প্রাণবাহী দুই শরীরে অন্তরঙ্গতার আর অন্ত থাকে না। যেমন বলিষ্ঠ উদারতা, তেমনি নিবিড় সহানুভূতি—এমন স্বামীর জন্য কবে, কোন জন্মে আভা তপস্যা করিয়াছিল? তাহার জন্য কী সে মূল্য দিতে পারে?

কিন্তু সেই দিন বই-খাতা ছড়াইয়া বসিবার আগে নলিনীর সেই মিথ্যা অভিযোগটাই সে রঙ্গলালের কাছে উত্থাপন করিতে গেলো। রঙ্গলাল হঠাৎ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল।. কহিল: তোমাকে বলেছি না আভা, এই সব তুচ্ছ ছোটো কথা আমাকে কোনো দিন বলতে পাবে না। ছোটো কথা তুমিই বা কেন বেশিক্ষণ মনে রাখতে যাবে?

রঙ্গলালের আঙুলের ফাঁক দিয়া আভা বোবা গলায় বলিল: কিন্তু তুমি ছাড়া কাকে আর বলবো?

—আমি আমার আপিসের সব তুচ্ছ কথা তোমাকে বলতে আসি? আমাদের কি ও সব ছাড়া আর কথা নেই? এই সব মন-ছোটো-করেদেয়া খুঁটিনাটি কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেই আমরা এসেছি

নাকি ? নিয়ে এসো তোমার সাইলাস মার্নার। দুপুরে পড়তে পেরেছ দু'এক পৃষ্ঠা ? ঘুমোওনি তো ? বই মেলিয়া স্বামীর পাশে ক্ষণিক ব্যবধান রচনা করিয়া আভা সমস্ত বিষস্মৃতি স্তিমিত, স্নিগ্ধ করিয়া আনে। দিনের সংসারে তাহার যেখানে যেটুকু ক্ষতচিহ্ন পড়ে, রাত্রির এই স্বামিসান্নিধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার সেই জ্বালা সহজেই জুড়াইয়া যায়।

রঙ্গলাল বলিল : তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দিলে মন্দ হতো না।

উৎসাহে আভা একেবারে উপচিয়া পড়িল : তাই দাও না। সকালবেলায়ই তো অনেক কলেজে মেয়েদের ক্লাশ খুলেছে—আমার স্কলারশিপএর টাকাটা আর এমনি মাঠে মারা যায় না তাহলে।

—কিন্তু তাতে সংসারের সঙ্গে বিরোধ আরো বাড়তে থাকবে।

আভা বলিল : সংসার বলতে তো মা। তা, কেন তিনি আপত্তি করবেন ? সকালবেলা একরকম তো আমি বসেই থাকি, আমাকে তো তাঁর ঘরে এখনো এক বছর রাঁধতে দেবেন না—পরেও দেন কিনা ঠিক নেই। ঠাকুর-চাকরই তো আছে—আর দুটি মাত্র তো লোক—তুমি জোর করলেই হয়ে যায়।

—না, যাতে মা'র আপত্তি আছে সে-কথায় জোর দিতে পারবো না।

আভা বলিল : সে-আপত্তি যদি অন্যায় হয়, তাহলেও ?

—এ ক্ষেত্রে মা'র আপত্তিটা মোটেই অন্যায় হবে না। তা ছাড়া—

দুই হাতে আভার মুখখানি মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া রঙ্গলাল কহিল : তোমার কলেজে পড়ার কিছু দরকার হবে না, আর পাশ না করলেই বা তোমার কী। আমিই তো তোমার আছি।

এমন সময়ে নিচে নামিবার সিঁড়ির কাছে রাজলক্ষ্মীর গলা শোনা গেলো : খুব দিগগজ হয়েছ, এখন পায়ের ভায়ে বাড়িতে ভূমিকম্প না হলে বাঁচি। এদিকে পান্না এসে যে খেতে নেমে গেলো তার সামনে গিয়ে একটু বসতে হয় তো ?

শাশুড়ির গলা পাইয়া বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আভা দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

—এতো যে ডাকছি, কানে যায় না বুঝি ? সারা দিন যে কেবল বইর ওপর মুখ গুঁজে বসে থাকো, তাতে তোমার কোন পুরুষ উদ্ধার হবে শুনি ? এদিকে পান্নাকে কে দেয়-থোয় দেখে-শোনে তার ঠিক নেই।

আভা না বলিয়া পারিল না : ঠাকুরপোই তো তাঁর ভাত চাপা দিয়ে রাখতে বলে যান। আমি আর গিয়ে কী করবো ?

রাজলক্ষ্মী ঘরের ভিতরে রঙ্গলালকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিল : তা যাবে কেন—আপন-পর যে এখুনি বাছতে শিখেছ ! বসে-বসে ফ্যাশান করে কেবল বই পড়বে ! তা, এতো বুড়ো বয়স পর্যন্ত পড়তে তোমার লজ্জা করে না ? এদিকে নলিনীর যে কিছুই পড়া-শোনা হচ্ছে না তা একবার চোখে পড়ে ? ওর কি ব্যবস্থা হবে সে-কথা একবার তোমরা ভাবো ?

নিচে নামিবার জন্য ধীরে-ধীরে দুই পা আগাইয়া আসিয়া আভা কহিল : সে-ব্যবস্থা আপনারা করবেন, আমি তার কী জানি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : মুখে-মুখে খালি তর্ক করতেই জানো, কিন্তু রঙ্গলাল এই যে এখন দিনে রাতে তোমাকে পড়াচ্ছে, কৈ, এক দিনো তো নলিনীকে নিয়ে বসতে দেখি না। তারো যে একটা গতি করতে হবে সেটা একবার মনে করে ও ?

আভা তবু কথা কহিবে : ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেই তো হয়—

—আর তোমার মতো অমন শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে কোলকুঁজো হয়ে বসে থাক্ ! ইস্কুলে একবার ঢুকলেই হলো, ঢেপসি না হয়ে আর কেউ বিয়ে করতে চায় না—সবাই ভাবে কি জানি একটা দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছি !

আঁচাইয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিতে-মুছিতে পান্নালাল উঠিয়া আসিল। রাজলক্ষ্মী কহিল : হয়ে গেলো এরি মধ্যে ? সব ছিলো তো ? মাছ দু'খানা রাখেনি ?

পান্নালাল কহিল : কে অতো হিসেব রাখে ? পেলাম আর গিললাম। ভীষণ ঘুম পেয়েছে। কী বৌদি, তুমি এখনো শুতে যাওনি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : এখুনি কী ? কতো বই এখনো পড়তে হবে। রোজ বারোটা-একটা। এখন আর এতে ইলেক্‌ট্রিক-বিলের খরচ বাড়ে না। কী, পান্নার বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে দিয়েছ তো ?

পান্নালাল নিজের ঘরের দিকে যাইতে-যাইতে হাসিয়া বলিল : আমার আবার বিছানা !

আভা কহিল : কোন দিন তোমার বিছানা না করি ?

পান্নালাল স্মিতমুখে কহিল : তা কে অস্বীকার করছে ? কথাটার একটা গভীর অর্থও থাকতে পারে—সে-দিকে কি তোমাদের হুঁস আছে ?

রাজলক্ষ্মী কথাটাকে অতি সহজেই বুঝিয়া লইল : হ্যাঁ, ওর আবার হুঁস থাকবে ? নিজেরটা নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা, বাড়ির আর কারো সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে মাথা ঘামাবার বা কী দরকার ! বলিয়া সে সোজা পান্নালালের ঘরে গেলো।

পান্নালাল বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, ঘরের মধ্যে সহসা অজস্র আলো দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া কহিল : ওখানে কী করছ, মা ?

রাজলক্ষ্মী তাহার পড়ার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; কহিল : দাঁড়া, তোর টেবিলটা গুছিয়ে দি। কী রকম নোংরা হয়ে আছে ! বইয়ে-খাতায় একটা পাহাড় !

পান্নালাল চেঁচাইয়া উঠিল : খবরদার মা, ওতে তুমি হাত দিতে যেও না। সব গোলমাল করে ফেলবে। কোথায় কি রাখবে তার ঠিক নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তা বলে জিনিস-পত্র এমনি ছড়িয়ে থাকবে নাকি ? আর কারো তো চোখ পড়ে না !

—থাক, হ্যাঁ, তাই থাক। বৌদিকে পর্যন্ত আমার টেবিলে হাত দিতে দিই না। তুমি এবার যাও। খাতা-পত্র অমন পাশাপাশি ভিড় করে না থাকলে পড়ায় আমার মন বসে না।

টেবিলের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মী পান্নালালের ব্র্যাকেট ঘাঁটিতে লাগিল : এ কী, তোর দুটো জামা-ই দেখছি ছিঁড়ে উঠেছে, তোর মেজ-দা'কে বলতে পারিস না? এদিকে হপ্তায়-হপ্তায় বৌর জন্যে রঙ-বেরঙের ব্লাউজ আসছে—কতো রকম শাড়ি, কতো ঢঙের জুতো। না চাইবি তো, ওর পাল্লায় পড়ে তুইও তোর সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দিবি কেন? ওর না-হয় চাকরি আছে, তোর আছে কী? তুই কেন তোর ন্যায্য অংশ কেড়ে নিবি না? নিবি না তো, এমনি হা-পিত্যেশ করে বেড়াবি নাকি?

পান্নালাল পাশ ফিরিয়া আলো আড়াল করিয়া কহিল : এ মহা মুশকিলে পড়লাম দেখছি। ঘুমুবার সময় কেন বক-বক করতে এসেছ? ব্র্যাকেটের জামা দুটো ছিঁড়ে থাকে, নিয়ে যাও—তা দিয়ে বাসন রেখো। ট্রাঙ্কে হয়তো গোটা পাঁচ-ছয়, ডাইংক্লিনিংএ তিনটে। চাকরি নেই তো, কী হয়েছে? এই দুটো হাত আছে না? তুমি এবার যাও বলছি, শিগগির আলো নেবাও।

সিঁড়ির ধার হইতে রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে আভা খানিকক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বলা-কহা-নাই বিশৃঙ্খল বইগুলি দুই ক্ষিপ্র হাতে গুছাইয়া লইতে লাগিল।

রঙ্গলাল কহিল : কী হলো ? আর পড়বে না ?

বইগুলি টেবিলের উপর সশব্দে নামাইয়া রাখিয়া আভা চাপা গলায় কহিল : না, আর কোনো দিন না। আর ককখনো তুমি আমাকে পড়াতে পারবে না বলে রাখছি।

রঙ্গলাল বলিল : কেন কী হলো ?

—আমাকে পড়াতে তোমার লজ্জা করে না ? বাড়িতে যার বিয়ের উপযুক্ত ভাগ্নি আছে, লেখা-পড়া শিখিয়ে তার একটা গতি করতে পারো না ? আমাকে দিগ্‌গজ করবার কী হয়েছে ?

রঙ্গলাল প্রবলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বাহিরের কথা কিছু-কিছু তাহার কানে আসিয়াছিল, তাই মজা পাইয়া কহিল : নলিনীকে তুমিই তো পড়াতে পারো। সে-বাবদ টিউশানির মাইনেও না-হয় তোমাকে দেয়া যাবে। আমি তোমাকে পড়িয়ে একেবারে ঠকে যাচ্ছি—কিছুই রোজগার নেই।

কিন্তু টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া আভা কাঁদিতে বসিয়াছে।

রঙ্গলাল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। গম্ভীর হইয়া কহিল, —ছি আভা, এ কী কাণ্ড ! তুমিও এমনি ছোটো হবে নাকি ?

আভা মুখ তুলিল না ; ফোঁপাইয়া উঠিয়া কহিল : না, সব সময়ে এই সব ছোটো কথা শুনে মানুষ ছোটো না হয়ে পারে ?

রঙ্গলাল তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দিলো। বলিল : তুমি যে দেখছি এখনো নিতান্ত কাঁচা, একেবারে পিছিয়ে আছো ! তোমার লেখা-পড়া শেখার ভীষণ দরকার, লেখা-পড়ায় আরো

উন্নত না হতে পারলে এ সব ক্ষুদ্রতা তুমি ডিঙিয়ে যাবে কী করে ? এসো, এসো, আরও বেশি করে পড়া-শুনা করে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে। বলিয়া এক হাতে রাশীকৃত বই ও অন্য হাতে আভাকে সে রাশীকৃত করিয়া বিছানার উপর লইয়া আসিল।

কিন্তু বিছানার উপর লইয়া আসিয়া রঙ্গলালের আর মাস্টারি করিতে ইচ্ছা হইল না। হঠাৎ হাত তুলিয়া দেয়ালের উপর স্যুইচ্‌টা অফ করিয়া দিলো। জানলার আড়ালে কোথায় এক ফালি জ্যোৎস্না মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলো, অন্ধকার হইতেই বিছানার এক প্রান্তে আসিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে।

জ্যোৎস্নার সেই শুভ্র ও সুকোমল রেখার চেয়ে আভার শরীরভঙ্গিটি অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি অপার্থিব মনে হইল। বালিশে গাল রাখিয়া আভা ঐ পাশে মুখ ফিরাইয়া আছে। ছোটো কপাল, চিবুকটি তীক্ষ্ণ, প্রোফাইল বা অর্ধাস্যরেখা একেবারে ছুরির ফলার মতো প্রখর। রঙ্গলাল ধীরে-ধীরে আভার মুখখানি জ্যোৎস্নায় লইয়া আসিল। হাসিয়া বলিল : এখনো কাঁদছ নাকি ? আভা তুই চক্ষু দৃষ্টিতে বিস্ফারিত করিয়া রঙ্গলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। জ্যোৎস্না তাহার কাছে লাগে না। সৌন্দর্য-বিচারের মানদণ্ডটা সংসারে কী স্থূল ! একমাত্র চর্মচক্ষুর মন্তব্যই সেখানে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। অথচ রঙ্গলালের তুই চক্ষে তাহার আত্মা গোপনে গভীরতর দৃষ্টি ফেলিতেছে—সেই দেখাতে আভার লাবণ্যের সে কূল পাইতেছে না। এই রূপ

বিধাতা সৃষ্টি করে নাই, এই রূপ রঙ্গলাল নিজে সৃষ্টি করিয়াছে। যাহার জন্য, যে আলোকসামান্যার জন্য সে এতো কাল নিভৃতে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে এমন করিয়া এই সন্নিহিত স্নেহের মাঝে কোনো দিন ধরা দিতো কিনা তাহা কে বলিতে পারে ?

সাত

আভাকে লইয়া রঙ্গলাল সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলো।

দিদি ও রাজলক্ষ্মী বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। নলিনী গিয়াছে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গুটি খেলিতে।

রেলিঙের ফাঁক দিয়া তেরছা করিয়া চাহিয়া দিদি বলিলেন: ঐ শাড়িখানা আবার কিনলো কোন দিন?

রাজলক্ষ্মী মুখ ঘুরাইয়া বলিল: কে জানে? হামেশাই তো কিনছে—আমাকে একবার দেখায় নাকি? বৌ-মানুষ নতুন শাড়ি পরলে শাশুড়িদের প্রণাম করে যায়—তা, ও-শিক্ষা কি ওর গুষ্টির কারো আছে? পাছে কিছু বলি সেই ভয়ে কেমন পালিয়ে গেলো দেখলে?

দিদি দুই চোখে টান দিয়া কহিলেন: আর পছন্দকেই বাপু বলিহারি। সেজেছেন—একেবারে জ্যান্ত একটি ছুছুন্দরি! কেষ্টঠাক্‌রুণ যাচ্ছেন কোথায়?

—কে জানে কোথায়! বিকেলে হাওয়া না খেলে সুন্দরীর খিদে

পায় না। আর এই ফাঁকে বুঝলে, দিদি, বাপের বাড়িটা ঘুরে আসে। সামনে বাপের বাড়ি হয়ে ও ডানা গজিয়েছে দেখো না। কই, বাপ তো একবার এসে নেমন্তন্ন করে যায় না—সেধে-সেধে জামাইকে এমন হ্যাংলাপনা করতে কোনো দিন দেখিনি, দিদি। যেমন রঙ্গটা হয়েছে আস্ত গণ্ডমূর্খ, বৌর কথায় বাঁদর-নাচ করছে। আমার যেমন কপাল!

দিদি বলিলেন : কানে ওটা আধহাত কী ঝুলছে দেখলাম।

ব্যথিত স্বরে রাজলক্ষ্মী বলিল : ঝাড়-লণ্ঠন। ঢঙিরা ওকে বলে ঝুম্‌কো। বুঝলে, দিদি, রঙ্গর এখন অনেক পয়সা। জামা-কাপড়ে বৌর বাক্স-প্যাঁটরা বোঝাই হয়ে গেলো—এদিকে পান্নার একটা আস্ত জামা নেই, আমাকে সেই যে পূজোয় একজোড়া থান দিয়েছিলো—তুমি দেখনি তার জমি, একেবারে জ্যালজেলে, দুটি মাস সমানে পরতে পারলাম না—তারপর একবার ভুলেও জিগগেস করলে না : 'মা, তোমাকে এক জোড়া কাপড় এনে দেব ?' ছি, আমি চাইতে যাবো কোন লজ্জায় ?

দিদি আঙুল নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিলেন : বুঝলি না, সব নষ্টের গোড়া হচ্ছে ঐ কালীমূর্ত্তি! যেমন বংশ, তেমনি চেহারা, তেমনি স্বভাব। কই তুই এখন শাশুড়ির সেবায় প্রাণপাত করবি, না, সোয়ামির বগল ধরে যাচ্ছেন উনি হাওয়া খেতে! ঘোমটার বালাই তো নেইই—তারপর ঢলানির হাসির কী বাহার! রাজ্যের লোকের মধ্যে গিয়ে এমনি বেহায়াপনা করতে মাগীর একটু লজ্জা

হয় না—মাগো ! ওর যাওয়া তুই বন্ধ করে দিতে পারিস না ? রাজলক্ষ্মী কপালে চোখ তুলিয়া কহিল : সর্বনাশ। তাহলে রঙ্গরই যে বুক ফেটে যাবে। বুঝলে, দিদি, ওকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। বৌরই তো সব বোঝা উচিত—ওরই তো উচিত সোয়ামিকে এ-ক্ষেত্রে নিরস্ত করা। ও যাবে না বললেই তো হয়। বলতে পারে না—ঘরের কাজ-কর্ম ফেলে আমি যাই কী করে ? এই ধরো না সেদিন—ওরা দুজনে আদ্ধেক রাত পর্যন্ত কী থিয়েটার দেখে এলো। ও বলতে পারতো না—মা আর মাসিমাকেও নিয়ে চলো ? পারতো না বলতে ? বাপের জন্মে কলকাতার থিয়েটার কী কোনো দিন জানলাম না।

গলা ফুলাইয়া দিদি বলিলেন : শাসন কর রাজী, শাসন কর। হাতের লাগাম আলগা দিলেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

—শাসন করবো কী, দিদি ? রঙ্গ কি আমাকে তেমন বৌ এনে দিয়েছে ? একেবারে একটা কাঠ-সেপাই। কিছু বলতে গেলে একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে তেড়ে আসে। কী টাস-টাস কথা, কী অন্তর-পুড়ুনি চিমটি ! আর বৌকে শাসন করতে গেলেই তো রঙ্গর মুখখানা এতোখানি ! ওর লাগে বলেই তো বৌকে কিছু বলতে পারি না। নইলে একেবারে তুলো ধুনে দিতাম না ?

দিদি বলিলেন : এই কেলেকুষ্টি বৌ পেয়ে ছেলেটার কি মতিভ্রম হলো নাকি ?

—তা ছাড়া বাপের বাড়িটাও হয়েছে কাছে। ধুরন্ধরিরা সব

আজকাল মেমসায়েব হয়েছে কি না—বাস্‌এ চড়ে পুরুষের ভিড়ে বসে চারআনায় যাওয়া-আসা করছে। নইলে বাপের বাড়ি ওর মফস্বলে হতো—অমন উড়াল দিয়ে যাওয়া ওর দেখে নিতাম। তারপর শোনো সেদিনের কাণ্ড—

রাজলক্ষ্মী দিদির কাছে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল: কী-একটু সেদিন সর্দি না কী হয়েছে—ঘরে উঁকি মেরে দেখি কোট-প্যাণ্টালুন পরা এক ডাক্তার এসেছে। একবার কীর্তিখানা দেখো—রঙ্গর পয়সার ওপর বৌর কী অগাধ মায়া; পয়সা তো নয় খোলামকুচি।

—আর রঙ্গর মায়াকেও বলিহারি। অমন বৌর জন্যে আবার ডাক্তার! পুরুষমানুষের আবার স্ত্রী-ভাবনা!

—অথচ এই দাঁতের ব্যথায় কতোদিন কষ্ট পাচ্ছি, ডাক্তার দূরের কথা, এক ফোঁটা ওষুধ পেলাম না। সবই আমার অদেষ্ট, দিদি, নইলে আমার এতো কষ্টের রঙ্গ কেন এমনি পর হয়ে যাবে বলো?

আস্তে আস্তে চারিদিক হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় আপিস হইতে ফিরিয়া খাবারের থালা সমুখে নিয়া রঙ্গলাল তাহার পাশে বসিত—বিলীয়মান আলোর বিষণ্ন আবহাওয়ায় বসিয়া তাহারা দুইজনে সুখ-দুঃখের কতো গল্প করিয়াছে। আজকাল রঙ্গলাল মা'র ধার দিয়াও আসে না—সেই জায়গাটা আজ শূন্য, সমস্ত সন্ধ্যা আজ বিচ্ছেদবেদনায় মন্থর, ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বেড়াইতে না গেলেও রঙ্গলাল ছাতে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বৌর সঙ্গেই এই সময়টা ব্যয় করিতে

ভালোবাসে—তাহার সুখ-দুঃখ, তাহার স্বপ্ন-সমস্যার মাঝে মা'র জন্য সে আর এতোটুকুও স্থান রাখে নাই। সামান্য একটু শরীর খারাপ হইলে বৌকেই সে আগে খবর দেয়—এবং তাহারই রঙ্গলালের জ্বরতপ্ত কপালে আর কাহার অধিকারগর্বিত আঙুল সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। তাহাকে জামায় সামান্য একটা বোতাম পর্যন্ত আর লাগাইতে হয় না। কী সে খায়, কতোখানি তাহার খিদে থাকে—কোনো খবরই তাহার জানা নাই; সময়ে-অসময়ে ক্ষুধা পাইলে মার কাছে আর সে কখনো হাত পাতে না, বৌকেই বলে, বৌ-ই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। বৌ নাকি ঠাকুরকে দিয়া রোজ রোজ কতো সব রাঁধায়—মলিনীর মুখে সব তাহার কানে আসে বটে—তাহা নাকি ঝালে-পেঁয়াজে ঘিয়ে-মশলায় ভীষণ উপাদেয়; রঙ্গলাল তাহা শতমুখে তারিফ করে, কিন্তু এতো উগ্র অখাদ্য যে রঙ্গলালের পেটে সহিবে না তাহা পর্যন্ত বলিবার মুখ তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে অনাত্মীয় একটা মেয়ে আসিয়া এক কথায় তাহার রঙ্গলালের সমস্ত ধাত জানিয়া বসিল। মা'র থেকে সেই এখন তাহার বেশি আপনার। সমস্ত ঘর-দোর সেই তদারক করে, আলস্য করিয়া একদিন অপরিষ্কার করিয়া রাখিলে কোনো কথাই তাহাকে আর শুনিতে হয় না। বৌ মশারি টাঙানো পছন্দ করে না দেখিয়া রঙ্গলাল কোথা হইতে কতোগুলি কী ধোঁয়ার কুণ্ডলী কিনিয়া আনিয়াছে—তাহার এখন অনেক পয়সা। সমস্ত সংসারে রাজলক্ষ্মীর স্থান আবার কেমন সংকীর্ণ হইয়া আসিল।

রঙ্গলালের ঘরে তাহার প্রবেশ আজ অনধিকারপ্রবেশ। বৌকে একটু শাসন করিতে গেলে রঙ্গলাল মনে-মনে আপত্তি করে, কেননা মা'র শাসনের পরেও সে তাহার সান্নিধ্যকে স্বীকার করে, সান্ত্বনা দেয়, তাহার শাসনের সমস্ত সুফল-সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া তোলে। এক কথায় তাহার বিচারকে সে সবলে উপেক্ষা করে——নহিলে বৌ কোন সাহসে, কিসের জোরে এমন ঝিলিক দিয়া বেড়ায়? ভাবিতে ভাবিতে রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। আপন ছেলের হাতে তাহার অধিকারের গর্ব এমন করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা সে অসহতম দুর্দিনেও কল্পনা করিতে পারিত না। আশ্চর্য, এই সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া সে যে এখন আগের মতোই পূজা-অর্চনায় মন দিবে তাহারো উপায় নাই। রঙ্গলালের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন!

তাহার একদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়িল। কালিকিঙ্করের বিরুদ্ধে মামলা করিবার জন্য সে যখন একদিন রঙ্গলালকে উত্তেজিত করিতেছিল, তখন রঙ্গলাল দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল: 'পৃথিবীতে সমস্ত পাওয়াই কি ঠিক-ঠিক তাদের মালিকের হাতে এসে পৌঁছোয়, মা? ও কথা চিরজীবনের জন্যে আমাকে ভুলতে দাও। আমরা দুই ভাই ঐ ক'টা তুচ্ছ টাকার বিনিময়ে যে সম্পত্তি পেয়েছি, তা স্বর্গের চেয়েও বড়ো। এই আমাদের সব চেয়ে বড়ো ভাগ। এ আমরা অর্জন করেছি, মা, ভিক্ষে করে এ আমাদের পেতে হয়নি!'

মিথ্যা কথা—জন্মভূমির সঙ্গে-সঙ্গে মাকেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া রাজলক্ষ্মী আবার কহিল: তার এখন অনেক পয়সা। তার মাইনে-টাইনে য়্যাদ্দিনে বাড়লো কি না তা-ও জানি নে। আর সে-খবর আমাকে বলবে কেন? য়্যাদ্দিন মাইনে পেয়ে আমার হাতেই তো তুলে দিতো—এবার দেখি তিরিশ টাকা কম! জিগগেস করাতে বললে: 'নিজের কয়েকটা খরচের জন্যে ও-টাকাটা রেখে দিলাম।' নিজের খরচ মানে বৌর বাবুগিরির খরচ। নোটগুলি ঠেলে দিয়ে বললাম: 'আমার কাছে আর কেন? বৌই তো দিব্যি খরচ করতে শিখেছে—সেই এবার থেকে রাখুক। তোদের কখন কী দরকার হবে আমি তার কী জানি?'

দিদি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন: নিস নি তো বেশ করেছিস। বাছাধন এবার টের পাবে।

—না নিয়ে পারলাম না, দিদি। রঙ্গলাল প্রায় কান্নাকাটি করবার যোগাড়। আমি ছাড়া নাকি তার কেউ নেই। কিন্তু ও-দিকে হাত-খরচেই তার আজকাল তিনগুণ বেরিয়ে যায়, ব্যাঙ্কে কিছু আর উঠতে পায় না। বৌ-ই সব গ্রাস করেছে।

দিদি কিছুটা সামলাইলেন যা-হোক: তা ছাড়া মাইনেও নিশ্চয় কিছু বেড়েছে, সেটা আর তোকে জানায় নি, বাড়তি টাকাটা বৌরই বাক্সবন্দী থাকে। নইলে যে দমকে খরচ করছে—

রাজলক্ষ্মী বলিল: তাই হবে। তা ছাড়া বৌর কল্যাণে

আরো এক খরচ বেড়েছে, দিদি। লাইফ-ইনসিয়োর করেছে—মাসে-মাসে তার টাকা গোনে—হঠাৎ যদি একটা কিছু তার ভালো-মন্দ হয়, তবে বৌর কী দুর্দশা হবে সেই ভাবনা তাকে এখন থেকেই পেয়ে বসেছে। শত্রুরো সেই দুর্দশার কথা মনে আনতে পারি না, দিদি, কিন্তু মা'র জন্যে কোনো দিন তাকে কিছু ভাবনা করতে দেখলাম না।

আভা কুণ্ঠিত পায়ে আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া আসিল। বাড়ির মুখে হঠাৎ এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইতেই রঙ্গলাল রোয়াকে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতেছে। বাহিরের জনতার মাঝে সে যে অবাধ মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল ঘরে আসিয়া পা দিতেই তাহা এক নিমেষে বিষময় হইয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে দেখিয়া ডাক দিলো: পেখম মেলে কোত্থেকে এলে?

আভা স্তব্ধ হইয়া গেলো। এতোক্ষণ এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হইতে সে কতো দূরের বিস্তৃতির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল—এই সব শ্বাসরোধী সংকীর্ণতার কথা তাহার মনেই ছিলো না।

রাজলক্ষ্মী আবার হাঁক দিল: ডাক দিলে যে শুনতে পাও না? এসো এদিকে।

—যাই। আভা শাড়িটা বদলাইবার পর্যন্ত সময় পাইল না, ব্রোচটা খুলিয়া আঁচল-স্থাপনের আধুনিকতাটা মার্জিত করিয়া সে অগ্রসর হইল।

মাসিমা বলিলেন : কানের মাথা খেয়েছ নাকি ? বলি, যুগলমূর্তি হয়ে গেছলে কোথায় ?

আভা দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্ট করিয়া কহিল : বায়স্কোপে।

—বায়স্কোপে ! রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ে ও ক্ষোভে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল : ক'টাকা খসলো ?

আভা কহিল : তা আমি কী জানি ?

—না, তা কি আর জানো ? ভাজা মাছ তুমি উলটে খেতে জানো না। এতো বিদ্যের জাহাজ, আর এইটুকু না জানলে তোমার চলবে কেন ? বলি, ক'টাকার সিটে বসেছিলে ?

আভা দ্বিধা করিল না, বলিল : দু'টাকা চারআনা করে।

রাজলক্ষ্মী দাঁত খিঁচাইয়া কহিল : তবে তখন জানো না বলছিলে যে ? এই যে এতোগুলি টাকা তুমি বার করে দিলে, সে-টাকা দিয়ে কতো কিছু হতে পারতো তা খেয়াল আছে ?

আভা তেমনি স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল : এ-কথা আমাকে বলে লাভ কী ? যার টাকা তাকে বললেই তো পারেন।

—শুনলে, বৌর একবার কথা শুনলে, দিদি। রঙ্গর টাকা তো এখন তোমার জন্যই উড়ছে—রঙ্গ যদি আমার মানুষ হতো, তো তোমার এই বেয়াদবিকে প্রশ্রয় দিতো না ! তা, সব টাকাই কি একলা উদরস্থ করতে হয় ? নলিনী—আমাদের নলিনী কী দোষ করলো ? ওকে নিয়ে যেতে পারতে না ?

আভা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল : আমি তো নিয়ে যাবার কর্তা নই।

মাসিমা বলিলেন : তুমি কর্তার বাবা। তুমি ইচ্ছে করলে কী না করতে পারো ? রঙ্গর না-হয় খেয়াল নেই, কিন্তু তোমার এতো দিকে এমন কড়া নজর, আর এইটুকু তোমার চোখে পড়লো না ? এ-সংসারে আছে বলে নলিনীর কি কোনোই সাধ-আহ্লাদ করতে নেই ?

আভা অতিশয় ভয়ে-ভয়ে কহিল : নলিনী এ-ছবির কিছু বুঝতো না।

মাসিমা গর্জন করিয়া উঠিলেন : না, কেবল একলা তুমিই বুঝেছ ! খবরদার, আমার নলিনীকে তুমি এমনি হেনস্তা করতে পারবে না।

আভা মনে-মনে ক্লান্ত, বিমর্ষ হইয়া উঠিল, তবু বিনীত অথচ স্পষ্ট ভাষায় সে কহিল : ওতে সব ইংরেজিতে কথা-বার্তা, ও কিছুই বুঝতে পারতো না। ওকে হেনস্তা করতে যাবো কেন ?

তাহার এই স্পষ্টতাই রাজলক্ষ্মীর অসহ্য লাগে। সে বলিল : না বুঝলেই নিয়ে যেতে পারো না এমন কি কথা আছে শুনি ? হেনস্তা করোই না এ-কথা মানি কী বলে ? ওর সঙ্গে তুমি মেশো, দুটো কথা কও ?

মাসিমা ফোড়ন দিলেন : নলিনী যে ইংরেজি জানে না। তোর বৌ যে ইংরিজি ছাড়া কথা কয় না।

আভা ভিতরে-ভিতরে জ্বলিতেছিল, তবু শান্ত হইয়াই কহিল : ওর সঙ্গে মেশবার আমি অযোগ্য, মা। ও এই বয়সে যা-সব

কথা বলতে শিখেছে তা এতো বড়ো হয়েও আপনারা ধারণা করতে পারবেন না।
দুই বোন হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল : কী, কী শিখেছে ও—যার সঙ্গে তুমি এঁটে ওঠো না ?
—সে-সব অত্যন্ত নোংরা বাজে কথা, তা আমি বলতে পারবো না।
মাসিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন : ডাক ডাক নলিনীকে। কী এমন ও কথা বলে যা বলতে তোমার কালো মুখ বেগ্‌নি হয়ে যাচ্ছে।
আভা বলিল : ওকে ডেকে লাভ নেই, ডাকলেও আমি ওর সঙ্গে তা নিয়ে তর্ক করতে পারবো না। ওর সঙ্গে এই জন্যেই আমি মিশতে পারি না যে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অসঙ্গত কৌতূহল ছাড়া আর ওর কোনো কথা নেই। মাপ করবেন, এ-সব বলবার আমার ইচ্ছা ছিলো না। ওকে ইস্কুলে পড়তে না দিয়ে খুব ভুল হয়েছে।
দুই হাত নাড়িয়া মাসিমা কহিলেন : ইস্কুলে পড়েই তো তোমার এই হায়া হয়েছে! শাশুড়িদের মুখে লাথি মেরে সোয়ামিকে নিয়ে ধেই-ধেই করে খালি নাচতে শিখেছ। আমার নলিনীর সঙ্গে তোমার পোড়ারমুখের আর তুলনা দিতে এসো না। বায়স্কোপের ইংরিজি বুঝতে পেরেছ বলেই ভেবো না তুমি নলিনীর চেয়ে খুব উঁচুয় চলে গেছ। তার এমন প্যাঁচার মতো মুখ নয়, গায়ে সে আলকাতরা মেখে জন্মায়নি—বুঝলে? অমন ঢের বায়স্কোপ সে দেখবে।

আভা তবুও কথা কহিবে : বায়স্কোপের ইংরিজি আমিও সব বুঝিনি, মা, তবু নলিনী যে আমার অনেক ওপরে এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেলো।

—দেখলে, দেখলে—দিদি ঘরের দিকে ইশারা করিয়া কহিলেন : ঐ যেই রঙ্গ ঘরে এসেছে টের পেলো, অমনি আলগোছে সরে পড়লো। ঘুঘু মেয়ে আবার নলিনীকে বলতে এসেছে পাকা।

রঙ্গলালের উপস্থিতি অনুভব করিয়া রাজলক্ষ্মীর মন আবার আর্দ্র, আকুল হইয়া উঠিল। কহিল : আগে তাকে ঠেলে পাঠাতে পারতাম না, এখন তাকে ঘরে রাখাই দায় হয়েছে।

দিদি ঝাঁজালো গলায় কহিলেন : তার একখানা কী বাহনই জোগাড় করে দিয়েছিস।

সহসা সমস্ত সংসার রাজলক্ষ্মীর কাছে শূন্য, অবাস্তব মনে হইতে লাগিল। এই মুহূর্তে তাহার কোথায় কিছু আশ্রয় আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। স্খলিত পায়ে রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল। রঙ্গলালের ঘরের দিকে একটা বিষাক্ত, কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে আস্তে-আস্তে পান্নালালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

পান্নালাল কঠিন মনোযোগসহকারে খাতায় একটা আঁক কষিতে-ছিল। রাজলক্ষ্মী আসিয়া তক্তাপোশে বসিতে পান্নালাল মুখ না ফিরাইয়াই কহিল: দু'ঘণ্টা বাদে মা। এখন এই আঁকটা নিয়ে আমি ভারি ব্যস্ত আছি। দু'ঘণ্টার আগে তোমার সংসারের দরকারি সব নালিশ-পত্র আমার আদালতে পেশ হচ্ছে না, মা। তুষ্ণীং তিষ্ঠ।

পান্নালালের কথায় কান না দিয়া রাজলক্ষ্মী আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল : কেবল খরচ আর খরচ। তখন খুব গায়ে লাগতো, এখন বৌ কি না, তাই। এদিকে মা-ভাই যে শুকিয়ে মরছে তার খেয়াল নেই। এমন সব-কর্ণরোচক কথায় কেহ বেশি-ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। পান্নালাল তাড়াতাড়ি বই-খাতা সরাইয়া রাখিয়া মা'র দিকে চেয়ারটা ঘুরাইয়া লইল— চোখে তাহার দুষ্ট কৌতূহল। বলিল : বলো, বৌদির জন্যে কী আবার নতুন খরচ হলো। শুনে রাখি। কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে না রাখলে পরে বিপদ আছে। বলো।

রাজলক্ষ্মী কাছে সরিয়া আসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল : এই দ্যাখ্ না বৌ নিয়ে বায়স্কোপ গিয়ে এক মুঠো টাকা উড়িয়ে দিয়ে এলো। অথচ নলিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে কী হয়েছিলো? বৌ তো আর আর কচি খুকিটি নয়, নিজে মনে করেই তো ওকে নিয়ে যেতে পারতো। দিদির কি রকম আজ লেগেছে বল্ দিকি। মা-মরা মেয়ে—

পান্নালাল বিস্মিত হইয়া কহিল : নলিনীকে নিয়ে যাবে কী? সস্ত্রীক বায়োস্কোপ দেখার তাহলে মানে কোথায়? বৌদি আর কচি খুকিটি নয় বলেই তো না নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

—কী যে বলিস! এতো টাকাই যখন যেতে পারলো—

—তখন আর যেতে পারে না। তারপর?

রাজলক্ষ্মী বলিল : তাই বলে খালি-খালি বৌকে নিয়ে এমনি বাবুগিরি করে টাকা উড়োবে নাকি ? আর পাঁচজনের দিকে চাইতে হয় না ?

পান্নালাল বলিল : মেজ-দা' তো তবু পদে আছে, মা, আমার তো ওঁর প্রতি ভীষণ সহানুভূতি হয়। বিয়ে করে ধ্বড়ো জোর বাস্-এ চেপে সিনেমায় যান। আমি তো বিয়ে করে বৌ নিয়ে এরোপ্লেনে হনিমুন্ করতে বেরুবো।

রাজলক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া কহিল : সে আবার কী ?

—সে একটা বিভীষিকা। শূন্যযান। মেজ-দা'র সামনে তো তবু পাঁচজন বলে কেউ আছে, আমার কাছে পৃথিবী বলেও কিছু থাকবে না। খালি আকাশ। বলিয়া পান্নালাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

মুখে-চোখে নৈরাশ্যের একটা ভঙ্গি করিয়া রাজলক্ষ্মী কহিল : এদিকে সর্বনাশটা যে তোরই হবে তার খেয়াল আছে ? ব্যাঙ্কে আর টাকা যাচ্ছে না—তোর বিলেত যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

চেয়ারে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া পান্নালাল বলিল : বাঁচা যাবে তাহলে। মেজদা'র এই একগুঁয়ে অভিভাবকত্ব থেকে কী করে ছাড়া পাবো, মনে-মনে তারই ফাঁক খুঁজছিলাম, বিলেতের ভয়ে আমাকে হয়তো শেষে একদিন অন্য কোনো দেশে গিয়ে পালাতে হতো—সমস্যাটা যদি এ-ভাবে এতো সহজে সমাধান হয়ে যায়, তবে আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তাহলে বিলেত তুই যাবি না নাকি ?
—রক্ষে করো। গলায় একটা ফাঁস বেঁধে দু'টো পাশ-বালিশের খোলে পা ঢুকিয়ে আমি ভূত সাজতে চাই না। আমার এই লম্বা কোঁচা ঢের ভালো, ইচ্ছে হলো পা দিয়ে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে ফুল-বাবুটির মতো গজেন্দ্র গমনে চলো, ইচ্ছে হলো মালকোঁচা মেরে চোঁচা ছুটে পালাও। খুঁটটি মেলে গায়ে জড়াও, রাস্তায় জল হলে দিব্যি হাঁটুর ওপর প্রমোশন দাও। একসঙ্গে এতো সংক্ষেপ ও এতো বিস্তারিত পোশাক সারা পৃথিবীতে কিছু আছে নাকি ? এই দেশ ছেড়ে আমি কোথায় যাবো ?
—তোরো শেষকালে এই অধোগতি হবে ?
পান্নালাল হাসিয়া বলিল : শেষকালে নয় মা, আদিকালের। আর বিলেত গেলেই বা কী ঊর্ধ্বগতি হতাম ? আমাদের দেশে কী নেই ? বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত বলো, পতিপ্রেম বলো, গল্পের প্লট বলো—কী তুমি এখানে না পাবে শুনি ? এই দিব্যি আছি, চিরকাল সহজ হয়েই থাকবো। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হালকা হইবার ভান করিয়া সে কহিল : তুমি আমাকে বাঁচালে, মা। তোমাকে কী দিয়ে আমি খুশি করতে পারি ? বৌ এনে নয়, তোমার ভয় নেই।
—আমার মনের মতো একটি এনে দিলে মন্দ কী ! রাজলক্ষ্মী হাসিল।
—তোমার আকাঙ্ক্ষা যে মিটছে না।

—তোর দিকেই তো আমি এখন চেয়ে আছি।

পান্নালাল হাসিয়া বলিল : তারপর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তখন আমিও যে মহাব্যস্ত। দাঁড়াও, তার চেয়েও ভালো উপায় আছে। পরীক্ষায় আমি খুব ভালো রেজাল্ট করবো মা।

—দিনে-রাত্রে তো কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়াস। বৌ এলে বরং ঘরে মন বসবে।

—কিন্তু সে-ঘরে তোমার মন বসলে হয়। তারপর আমার বৌ! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তার মুখ-চোখের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল।

পান্নালাল বলিল : আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই হচ্ছে সাফল্যের প্রথম সোপান। আড্ডা দিয়ে-দিয়ে ভালো ছাত্রদের পড়া নষ্ট করে দিতে হয়। আঃ, বিলেত যেতে হবে না—ফোড়ায় ফোমেণ্ট করার মতো আরাম পাচ্ছি, মা। বাঁধা রাস্তায় বড়ো হতে হবে না—সে একটা মস্ত কথা। মৌলিক কিছু করবো। যাক, অঙ্কটা এবার মেলাতে পারবো মনে হচ্ছে। বলিয়া টেবিলের কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া পান্না খাতা-পেনসিল লইয়া মত্ত হইয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী আরো খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেক কথাই তাহার মনের মধ্যে হাঁসফাঁস করিতেছে, তাহা সবিস্তারে বহুবিশেষণ-সংযোগে প্রকাশ করা গেলো না বলিয়া তাহার অস্বস্তির অবধি রহিল না। পান্নালালের কাছেও তাহার ঠাঁই নাই—পান্নালালও তাহাকে বুঝিবে না।

আট

সকালবেলা চা খাইবার সঙ্গে-সঙ্গে রঙ্গলাল খবরের কাগজ পড়িতেছিল—এমন সময় মা'র তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভাঙা প্যারাগ্রাফের মধ্যেই থামিয়া গেলো। কোথায় কোন অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষেই বোধ করি স্বরের উচ্চতা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাকে ঠিক মা'র অন্যান্য শোকাবহ স্বগতোক্তির পর্যায়ে ফেলা সম্ভব মনে হইল না। রঙ্গলাল কান খাড়া করিয়া রাখিল। প্রতিপক্ষটি যে কে সেই এইবার স্পষ্ট বুঝিয়াছে। কেননা মা'র ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু স্বরের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে-সঙ্গে আভার কথাও বেশ স্পষ্ট, উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মা'র সঙ্গে সমতা রাখিবার স্পর্ধাও তাহারা করিতে পারে না, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ততাই কথাগুলিকে বেশি অর্থবান করিয়া তুলিতেছে। রঙ্গলাল স্পষ্ট শুনিতে পাইল কাটা-কাটা কথাগুলিতে ছুরির ফলার তীক্ষ্ণতা, বিদ্যুৎ-স্ফুরণের দুঃসহ ঔজ্জ্বল্য —তাহাতে ভাবাকুলতার এতোটুকু বাষ্প নাই। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মাঝে-মাঝে যে দু'একটা কথা বলিতেছে তাহাদের

ক্ষণস্থায়িত্ব মা'র একটানা, দীর্ঘচ্ছন্দী বিলাপের চেয়ে ঢের বেশি প্রখর, ঢের বেশি উলঙ্গ। স্বরগ্রামের উচ্ছৃঙ্খল উচ্চতায় সে না পারিলেও যুক্তিতে ও সত্যবাদিতায় সেই জয়লাভ করিবে এমনি আভার একটা উদ্ধত ভঙ্গি।

সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্বিক অনুধাবন করিতে না পারিলেও যেটুকু তাহার কানে আসিল তাহাতে তাহার মন অত্যন্ত ক্লান্ত, বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর মা এখন যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে এই ঔদাস্য অবলম্বন করাই প্রাণান্তকর পরিশ্রম মনে হইতেছে। তবু রঙ্গলাল খবরের কাগজের পৃষ্ঠার উপর দুই চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া ভারতবর্ষের অর্থ-সমস্যার জটিলতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিল। কোলাহলের মুখে মৌনতা যে কতো মুখর, কতো কার্যকরী তাহা সে জানে।

কিন্তু আভা যে একেবারে চুপ করিতেছে না কেন?

আভাকে সে কতোদিন বলিয়াছে মা'র কথার কখনো কোনো মুহূর্তে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। তাহা যতোই রূঢ় হোক, অযৌক্তিক হোক, তবু তোমাকে তাহার কাছে—আমারই জন্য, একমাত্র আমারই জন্য—নির্বিবাদে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। বড়ো আদর্শের জন্য এতো মানুষ সহ্য করে, আর সে তাহার এই স্বামিপ্রেমের জন্য এই মিথ্যা সম্মানবোধের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবে না? প্রতিবারই আভা স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহার কাছে সেই কথা স্বীকার করিয়া যায়, কিন্তু ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া

কোনোবারই সে নিঃশব্দ, নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। কেন সে এমন অসহিষ্ণু ?

রঙ্গলাল আভার এই অতিভাষণের নির্লজ্জতায় মনে-মনে আগুন হইয়া উঠিল। তাহার মা পুরাতন সংস্কার ও প্রথার প্রতিনিধি—তাহা সে জানে ; তাঁহার কাছে যুক্তির চেয়ে ভাবের মাহাত্ম্য বেশি, স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে গতানুগতিকতার মোহ প্রবলতর—তাই বলিয়া আধুনিকতার অদম্য প্রাণস্রোতে সেই ভিত্তি এমন করিয়া টলাইয়া দিতে হইবে নাকি ? তবু তিনি তাহাদের মা, সহানুভূতির দাবি না করিলেও তিনি সম্মানের অধিকারী। আভা কোন অধিকারের অহঙ্কারে তাঁহাকে অপমান করিবে, আঘাত দিবে ? এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রূঢ়ভাষী, ব্যক্তিত্বলোভী মা'র অন্তরতম মহিমার কতোটুকু ইতিহাস সে জানে ? সংসারে উদার পটভূমি রচনা করিয়া মা'র বিস্তৃত বিরাজমানতার কী অপূর্ব সার্থকতা আছে তাহা সংকীর্ণ-কল্পনা-ক্লিষ্ট আভা কী বুঝিবে ? সেই মা হোক নির্মম. হোক কটুকণ্ঠ, হোক ক্ষুদ্রবুদ্ধি—তবু তাঁহার শরীরিক অস্তিত্বটাই যে সংসার-যাপনের পক্ষে কী স্নিগ্ধতাময়, মিলনের উগ্রতার মাঝে কী সুন্দর অন্তরাল, তাহা আভা বোঝে না, তাই সে তাঁহাকে অপমান করিতে সাহস পায়। রঙ্গলালের ইচ্ছা হইল ঐ ঘরে ছুটিয়া গিয়া কোনো কথা জানিতে না চাহিয়া প্রবলকণ্ঠে আভাকে শাসন করে, তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া আসে—কিন্তু ঐ ঘরে এখন হাজির হইলেই কোলাহলের উপর দ্রুত যবনিকাপাত হইবে না। তাহা

ছাড়া ঝগড়া থামাইবার চেষ্টা করিতে গেলে ঠিক যে কাহার পক্ষ নেওয়া হইবে সেটা নিজেই সে বুঝিতে পারিল না। আভাই তো তা বুঝিতে পারে। কথা একটাও না কহিলে কী এমন তাহার রাজ্যপতন হয়!

আভাকে সে কতোদিন বলিয়াছে: এই বা 'কেমন কথা, তুমি মা'র মন পাবে না? তিনি অবুঝ হলেনই বা, মানুষ বনের পশু বশ করতে পারে, আর তুমি আমার মাকে বশ করতে পারো না?

আভা বলিয়াছে: আমার সাধ্য মতো কোনো ত্রুটিই আমি করি না, কিন্তু আমি আমার গায়ের রঙ কী করে বদলাবো বলো?

—এ আমি বিশ্বাসই করতে পারবো না, আভা। সেটা গোড়ায় থাকতে পারে, কিন্তু চোখে এখন তা সয়ে যাবার কথা—তুমি তোমার অপরাধের জন্য কারণ খোঁজো—ঠিক পেয়ে যাবে দেখো। তোমার এই কালো রঙের লাবণ্যে আমার মতো নিঃস্পৃহ সন্নেসিকে পর্যন্ত ঘায়েল করলে—ও-কথা তোমার আমি মানবো না, আভা।

আভা হাসিয়া বলিয়াছে: ওটাই তো আমার মস্ত অপরাধ, নিজে ইচ্ছে করে কালো মেয়ে বিয়ে করলে, তাতেও তুমি ক্ষান্ত হলে না, তাকে কি না ভালোবাসলে—কোথাও এতোটুকু কৃপণতা করলে না। তারপর—

—বলো।

—তারপর—আজো আমার মা হবার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

রঙ্গলাল তাহার মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছে : এ সব তো তাঁর দিক থেকে কথা হলো, কিন্তু শত ঘৃণা-নিন্দা সত্ত্বেও তোমার কতোখানি দায়িত্ব আছে তা একবার ভেবে দেখেছ ? তুমি নিজে থেকে তাঁকে আক্রমণ করো সেবায়, আরাধনায়, বাধ্যতায়, বিনয়ে। তাঁকে বন্দী করে রাখো তোমার অসহায় দুর্বল নির্ভরশীলতায়। পারবে না ? ভাঙন-নদী পর্যন্ত শান্ত, স্তব্ধ হয়ে আসে--তাঁর নিষ্ঠুর শূন্যতার ওপরে তুমি চর হয়ে জেগে উঠে তাঁকে ভরাট করে দাও। এই সংসারে তাঁকে তুমি নতুন স্থান, নতুন রূপ দেবার সুযোগ তৈরি করো। তোমার এখন কতো কাজ, কী অসীম কর্তৃত্ব। আর্টিস্টের মতো এ-সংসার তুমি সৃষ্টি করবে বলেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি। মা হচ্ছেন এই সংসারের পৃষ্ঠপট।

আভা তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া অস্পষ্ট অসহায় স্বরে বলিয়াছে : আমার আর কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কথা শুনিয়া রঙ্গলালের বুকটা ধক করিয়া উঠিয়াছিল। এই কথার আড়ালে কী ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বুঝিতে আর বাকি ছিলো না। অর্থাৎ আভা এমন জায়গায় যাইতে চায় যেখানে রঙ্গলাল ছাড়া তাহার আর কেহ নাই ; সংসার যদি তাহাকে সৃষ্টিই করিতে হয় তবে সে আপন সংসার সৃষ্টি করিবে—আর্টিস্ট মাত্রেই সজ্ঞান, আত্মসুখপরায়ণ, স্বার্থসৌন্দর্যলিপ্সু। পরের রুচি সে প্রত্যাহার

করে, পরের সমালোচনায় সে নির্বিকার। আভাও তাই পৃথিবীতে এমন একটি স্থান কামনা করে যেখানে কবির কবিতার মতো তাহারই একমাত্র রসগ্রহণের আদিম ও অনন্যসাধারণ অধিকার থাকিবে। পরের কদর্থে কিছু আসিয়া যাইবে না।

রঙ্গলাল বলিয়াছে : যেখানে যাবে মাকে ফেলে. যেতে চাও তো ? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে আশা করি, কিন্তু আমি মাকে ছেড়ে কোথায় কার কাছে গিয়ে থাকবো ?

আভা স্বামীর শিথিল আলিঙ্গন হইতে খসিয়া বালিশের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। কোনো কথা বলে নাই।

রঙ্গলাল আবার বলিয়াছে : আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখো, আভা। তাকাও বলছি। মাকে তুমি ফিরিয়ে আনো। রঙের গৌরব নেই, কিন্তু অন্তরে তোমার কী ঐশ্বর্য আছে তা তো জানি। বলো, পারবে ?

স্বামীর মুখের দিকে ভীরু দুইটি চোখ তুলিয়া আভা বলিয়াছে, —চেষ্টা করে দেখবো।

কিন্তু এই তার চেষ্টা ? কথার পিঠে কথা, হঠাৎ মাঝখানে সমাপ্তির রেখা টানিয়া তাহাকে অনর্থক তীক্ষ্ণ করিয়া তোলা। এবং সেই কথাগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আছে কতো না-জানি শানিত ভ্রূ-ভঙ্গি ও রূঢ় দৃষ্টি! কতো না-জানি অহঙ্কার! রঙ্গলাল চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই সমস্ত ব্যাপারটার অপার তুচ্ছতা তাহাকে উপহাস

করিত লাগিল। সে ইহার মধ্যে গিয়া কী করিবে? কিন্তু ঐ, আভা আবার কী কহিতেছে। অসম্ভব! মাকে সে এই ভাবে অপমানিত হইতে দিবে নাকি?

কিন্তু পিছন ফিরিবার আগেই দ্রুত পায়ে আভা ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তাহার মুখ গম্ভীর, মেঘলা দিনের মতো থমথম করিতেছে, কপালের রগ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে—চোখে এতোটুকু স্নিগ্ধতা নাই। রঙ্গলালের মুখে খানিকক্ষণ কোনো কথা আসিল না। আভা আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সঙ্গে তাহার টেবিল গুছাইতে হাত দিলো; যেন কোথাও কিছু অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে নাই, আর ঘটিয়া থাকিলেও তাহাতে তাহারই জয় হইয়াছে। যদি সে এখন খাটের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িত—তাহা হইলেও তাহার ব্যবহারে খানিকটা লাবণ্য থাকিত—এই অপমানের জ্বালা মাকে এমন করিয়া নিঃশেষে পুড়াইয়া মারিত না। তাহার মায়ের এই পরাভবের বিজ্ঞাপনটা রঙ্গলালের কাছে অসহ্য লাগিল। কিন্তু কথা পাড়িতে গেলেই হয়তো আবার আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে।

রাজলক্ষ্মীর কথাটা তখনো শেষ হয় নাই, তাই এই দিকেই বোধকরি সে আসিতেছে। তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সেই নির্লিপ্ত স্বরে আভা কহিল: তোমার সেই বইটা খুঁজে পেয়েছি, নিচের ঘরে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের মধ্যে পড়েছিলো—

যেন রাজলক্ষ্মীকে শুনাইয়া বলা: আমার কিছুই হয় নাই—

দিব্যি আমি আমার স্বামীর স্নেহাচ্ছাদনের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছি। তাহার এই পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিটা রঙ্গলালকেও অসহ্য পীড়া দিতে লাগিল। কর্কশ হইয়া কহিল : কেন তুমি সব সময় মা'র মুখের ওপর কথা কইবে? তোমাকে বলেছি না, চুপ করে থাকবে, প্রতিবাদ করতে পাবে না?

রাজলক্ষ্মী তুই পা আগাইয়া থামিয়া পড়িল। ছেলের শাসনটা তাহার মনঃপূত হইবে না জানে, তবু দেখা যাক; তাহার কথা এখনো শেষ হয় নাই। আভা চোখ তুলিয়া কহিল : সব সময়ে নয়। মুখ বুজে থাকবারো একটা সীমা আছে। এক-এক সময় পারি না, পারা যায় না, তুমিও পারতে না। রঙ্গলাল ধমক দিয়া উঠিল : না, তোমাকে পারতে হবে।

—এ তোমার অন্যায় কথা। মানুষের শরীরকে অতিক্রম করা মানুষের সম্ভব নয়।

—কিন্তু মা তোমার গুরুজন নন? তাঁকে তুমি আঘাত দিতে যাও কোন লজ্জায়?

আভা বলিল : গুরুজন বলে মানি, মানতে আমার বাধা নেই, কিন্তু আমিও যে স্নেহভাজন সেটা তিনি রাত্রি-দিন ভুলে থাকলে চলে কী করে? ক্ষমা করবার মহত্ত্ব তাঁরই বা কেন থাকবে না?

রঙ্গলাল শাসনের সুরে কহিল : চুপ করো। বাজে কথা বলতে হবে না?

—বেশ, কাজের কথাই তবে শোনো। এই শাড়িটা পরনে দেখছ,

সকালে উঠে স্নান করে পরে মা'র পূজার ঘরে গেছি টাটে ফুল সাজাতে। মা এসে তোমার নাম করে জিগগেস করলেন : 'এই শাড়ি আবার তোমাকে কবে কিনে দিলো ?' সঙ্গে অবিশ্যি আরো অনেক কথা। আমি বলবার মধ্যে শুধু বললাম : 'উনি কিনে দেন নি, বাবা দিয়েছেন।' সেই কথা তো মা বিশ্বাস করলেনই না, উল্‌টে বাবাকে যা-তা গালি দিতে লাগলেন। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু গরিব বলে বাবাকে এই—

কথা শেষ না হইতে রাজলক্ষ্মী ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল : তোমার বাবাকে কী খারাপ কথাটা বলেছি শুনি ?

আভা তবু কথা কহিবে : সে-সব কথা মেয়ে হয়ে আমি মুখে আনতে পারবো না।

রঙ্গলাল তাহার মুখের উপর গর্জন করিয়া উঠিল : চুপ করো বলছি।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল : কেন বলবো না শুনি ? একশো বার চামার বলবো। বলতে হয় বলে বলবো। গায়ে যে একখানা গয়না ঠেকালো না, পূজোয়-পার্ব্বনে যে একটা তত্ত্ব করে না, সে দেবে অমন শাড়ি কিনে ? বিশ্বাস করলেই হলো ? আমি জানি না তোমার কীর্তি ! সোয়ামিকে দিয়ে হপ্তায়-হপ্তায় নতুন-নতুন শাড়ি কেনাও, আর চালিয়ে দাও—তোমার সই দিয়েছে। কি আমার সই রে !

আভা চুপ করিয়াই রহিল। কিন্তু কথা বলিল রঙ্গলাল : কেন মা,

আর কথা বাড়াও? মেয়ের কাছে বাপের নিন্দে করাটা কি ঠিক?

—তুই তো তা বলবিই। তুই কি আর তোর বৌর দোষ দেখতে পাস? ও যে আমায় এতো গাল-মন্দ করল সেইটে তুই দেখবি না? তুই আমার তেমন ছেলে হলে ওকে এক্ষুনি ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দিতিস। কী না বলেছে ও, পায়ের তলায় ফেলে থেঁতলে দিতে খালি বাকি রেখেছে। রাজলক্ষ্মী কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতে লাগিল : বৌর দোষ দেখবি কেন? তাকে কিছু না বলে আমাকে তুই শাসাতে এসেছিস?

রঙ্গলাল নিরুপায় হইয়া কহিল : বেশ তো, তুমি শাসন করলেই তো পারো।

রাজলক্ষ্মী গর্বিত ভঙ্গিতে কহিল : সেই অধিকার যদি আমার থাকতো তো ঐ হতচ্ছাড়িকে আমি এক্ষুনি বার করে দিতাম। আমি তো তোর মা নই, আমি তো তোকে পেটে ধরিনি, তাই আজ ও আমাকে যা-তা বলে পার পেয়ে যাচ্ছে—

আভার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা আবার অসম্ভব হইল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—বেশ, আমাকে বাবার কাছে রেখে আসবে চলো।

—বলতে লজ্জা করে না? রাজলক্ষ্মী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল : কী আমার বাপের বাড়ি রে! বাপ একবার আসে না তো দেখি জিগগেস করতে। দুজনেই তো খালি ল্যা-ল্যা করতে-করতে যাস —আবার বলিস কিনা শাসন করতে? শাসন করবার পথ কিছু

রেখেছিস নাকি ? ইচ্ছা মতো শাড়ি ঘুরিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, দু'বেলা এতো খেয়েও আবার হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছিস, বায়স্কোপ-থিয়েটার—কোনটা ওর বাদ পড়েছে শুনি! এর পর আবার শাসন চলে নাকি ? কিছু বলতে গেলেই কেবল ফোঁস করে উঠে ছোবল মারে—আর মারবেই বা না কেন ? তুই একেবারে ওকে মাথায় করে রেখেছিস—নইলে আজ যা আমার ও অপমান করেছে তা নিতান্ত তোর মা বলে আমাকে হজম করতে হলো।

রঙ্গলাল বিরক্ত হইয়া কহিল : থামো মা, থামো। আর ভালো লাগে না।

—আমাকেই তো থামতে বলবি। আর আমাকে যে ও এতো কথা শুনিয়ে দিলে তার কোনো প্রতিবিধান হবে না ? আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে ওকে কিনা তুই হোটেলে নিয়ে গিয়ে গেলাবি, পায়ের তলায় দোকান উজাড় করে দিবি ? আর আমরা উপোস করে মরবো ?

আভা সেইখানে টিকিতে পারিল না। কথা না বলিতে পারাটা যে কী নিদারুণ শাস্তি তাহা মর্মে-মর্মে অনুভব করিয়া সে পলাইয়া গেলো।

রঙ্গলালও ঈষৎ তপ্ত হইয়া উঠিল ; কহিল : কী কতোগুলি বাজে কথা বলছ, মা। তোমাকে যদি ও অন্যায় কথা বলে থাকে, তার নিশ্চয়ই তবে শাসন আছে, কিন্তু উঠতে-বসতে তুমিই বা ওর

বাপ তুলবে কেন? কখনো তো একটু স্নেহ করতে দেখিনি। মাসিমা এতোক্ষণ আড়ালে ছিলেন, এইবার সামনে আসিয়া কহিলেন: কথার ছিরি দেখো না একবার। বৌর বেলায় 'যদি অন্যায় বলে থাকে'—আর মা'র বেলায় একেবারে সরাসরি বিচার! কালে-কালে কতোই আরো দেখতে পাবো।

এই কথাটা ভীষণ কাজ করিয়া বসিল। দিদির এই অনাহূত সান্ত্বনায় রাজলক্ষ্মী একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, কান্নায় গলিয়া গিয়া কহিল: ওকেই আমি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিলাম দিদি, ওকে আমি কতো কষ্টে পড়ে মানুষ করেছি; আজ কিনা বৌর হয়ে ও আমাকে এমনি অপমান করছে? আমার চেয়ে বৌ-ই এখন ওর বড়ো, এই সংসারে আমার একটা ঝি-চাকরেরো সম্মান নেই।

রঙ্গলাল বলিল: কিছুই তোমাকে অসম্মান করা হয়নি, মা। রাত-দিন ধরে এই নোংরা কথা-কাটাকাটি আমার সহ্য হয় না। বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলো।

উপরে তুই বোনে মিলিয়া অনেক বিলাপ শুরু হইয়াছে, নিচের ঘরে আসিয়া পৌঁছিতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিল। রঙ্গলালের মন চতুর্দিকের এই জটিল আবেষ্টনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। পরিপার্শ্বের এই বিস্তীর্ণ অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলে সে বাঁচিয়া যাইত বোধকরি। কিন্তু তাহার জন্য, তাহার চারিদিকে এই অবরোধ রচনা করিবার জন্য, মা'র প্রতি তাহার অশোভন কোনো অভিযোগ নাই, কেননা আভাই এই অবরোধকে মুক্তির

চেয়েও সুস্বাদুতর করিয়া তুলিতেছিল এবং এই মা'র জন্যই আভাকে সে পাইয়াছে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্বলাভের সংঘর্ষে সংসারে যে প্রতিদিন অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে, সেই ছন্দোহীনতাই রঙ্গলালকে বিমর্ষ, ক্লান্ত, নিরাশ্রয় করিয়া তুলিল। কোথাও সে চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে—যেখানে মা নাই, আভা নাই, জীবনের যেখানে কোনো মহৎ আকাঙ্ক্ষার কণামাত্র আলো পড়ে না।

মা'র প্রতি তাহার সমান শ্রদ্ধা, আভার প্রতি নতুন, পরিপূর্ণ, প্রচুর ভালোবাসা। দুইজনের কাছেই সে সমান কৃতজ্ঞ, সমান প্রার্থী। কিন্তু সংসারের পক্ষে যেইখানে তাহার কর্মাবসানের পর বিস্তীর্ণ শান্তির প্রয়োজন, সেইখানেই দুইজন বিরোধের বাক্যজালে সমস্ত আবহাওয়া কুণ্ঠিত, কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে এবং রঙ্গলাল দুইজনের কাছেই ভীষণ অসহায়। আভার প্রতি তাহার এতোদিনকার প্রতীক্ষাতীক্ষ্ণ, স্বপ্নরঞ্জিত প্রেম অজস্র হইয়া উঠিতে পারে না; মায়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধায় কোথায় যেন কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। দুইয়ের মাঝে পড়িয়া সে যেন আর রঙ্গলাল নাই। অত্যন্ত চতুর, কৌশলী, কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। সুবিধাবাদী, দ্বিধাগ্রস্ত, অত্যন্ত ব্যবহারিক জীবন। কেবল অন্তঃসারহীন মৌখিকতা, কেবল জোর করিয়া ভদ্রতা বাঁচাইয়া চলা। দিনে-দিনে এ সে কী হইয়া পড়িতেছে? মাত্র সাংসারিক সামঞ্জস্যে সুখ কোথায়?

তবু সমস্ত রাগ তাহার আভার উপরে গিয়াই পড়িল। মানুষ হইয়া কেহই সমস্ত স্নায়ুদৌর্বল্য এড়াইয়া যাইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার প্রেমে কেন সেই অনৌদার্যকে ক্ষমা করিতে পারিবে না? প্রেম যদি তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা আনিয়া থাকে তো দাক্ষিণ্যের অভাব হইবে কেন? এই যে সে মায়ের উপর রাগ করিয়া নিচে চলিয়া আসিল, মা যে তাহার এই মিথ্যা পক্ষপাতিত্ব নিয়া অযথা শোক করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই সে মনে-মনে খুশি হইতেছে। মা'র কাছ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া রঙ্গলালের উপর এই আধিপত্যে সে খুব গর্বিত; কোথাও তাহার এতোটুকু দৈন্য নাই, ক্ষতি নাই—এমনি একটা কঠিন, নির্লিপ্ত ব্যবহার। তাহার মনোভাব সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে। নারীমাত্রই ক্ষুদ্রস্বার্থলিপ্সু, এবং সেই ক্ষুদ্র স্বার্থের অধিকারে অপরিমাণ স্ফীত হওয়াই তাহার স্বভাব। যাহা সে সহজে পায়, তাহার উপরেই তাহার জন্মগত দাবির একটা অতিকায় অহঙ্কার হয়, তাহা ছাড়া কিছু সে অর্জন করিবার জন্য সাধনা করে না। নহিলে মা'র নিকট হইতে তাহাকে এই প্রতিপদে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া আসিতে তাহার এই সুগোপন চেষ্টা কেন? এবং সেই চেষ্টায়, ঘটনাচক্রে, রঙ্গলালের প্রাণপণ অনিচ্ছায়ও যখন সে সামান্য সফল হয়, তখন সে মনে-মনে তৃপ্তিই অনুভব করে হয়তো। রঙ্গলাল কী করিতে পারে? আভাকে ন্যায়াতিরিক্ত শাসন করিতে সে নিজেরই কাছে সায় পায় না,

মাকে কিছু বুঝাইয়া বলিতে গেলে তো এই কাণ্ড। আভার নিজেরই তো সমস্ত দিক সহজ করিয়া গুছাইয়া নেওয়া উচিত—তাহার এই সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির অহঙ্কার রঙ্গলাল কিছুতেই সহ্য করিবে না। কিন্তু কী তাহার করিবার আছে? দুজনকেই যে সে ভালোবাসে।

নয়

দিন এই ভাবে চলিতে পারে না। সামঞ্জস্যেরো একটা নিয়ম আছে, পরিমাণ আছে।

আজ ছুটির দিন পান্নালালের হঠাৎ চিংড়ি মাছের কাটলেট খাইবার শখ হইয়াছে। কথাটা সে বৌদির কাছেই পাড়িয়াছিল, কিন্তু গা পাতিয়া উত্তর দিতে গেলো রাজলক্ষ্মী: ওরা কি আর তোর পছন্দমতো রান্না করবে নাকি? ইচ্ছে হয়ে থাকে, পয়সা নিয়ে দোকান থেকে খেয়ে আয় গে।

পান্নালাল হাসিয়া বলিল: সেও তো দাদার ওরফে বৌদিরই পয়সা। বিশেষ আর কী লাভ হবে?

—তবে কষ্ট করে রাঁধবে নাকি ভেবেছিস?

—রাঁধলে তো বৌদিরো লাভ। পরে খেতে তো পারবেই, আগেও ত্বয়েকটা চেখে দেখবার সুবিধে হবে।

—ঐ চাখতেই জানে। রোজ-রোজ রঙ্গ ঠোঙায় করে বৌর জন্যে কতো কি সব খাবার নিয়ে আসে, তোকে দেয় তু'একখানা?

নলিনীকে তবু যা তু'এক টুকরো দেয় বলে কথাটা কানে আসে।

পান্নালাল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিল : ছি, ছি, বৌদি আমাকে বড্ড ঠকাচ্ছে তো ? কিন্তু আমিও বৌদিকে কম ঠকাই না, মা। চীনে-সাহেবি হোটেলে গিয়ে আমি যে সব খাদ্য খাই, বৌদি তার নামও শোনেনি। শুনলে তুমি খুশি হবে কিনা জানি না কিন্তু পেটের মধ্যে তারা একদিন আশ্রয় পেয়েছিলো জানলে হয়তো তুমিও আমাকে ছোঁবে না।

রাজলক্ষ্মী আভাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল : কী গো, বলি, মাছ আনতে দেবে নাকি ?

আভা বলিল : এ আবার কী বেশি কথা !

—বেশি কথা তো নয়, কিন্তু ওকে তো একটিবারো তোমাকে জিগগেস করতে দেখি না : ঠাকুরপো, তুমি আজ কী খাবে ? কী খেতে তুমি ভালোবাসো ? সোয়ামি-স্ত্রীতেই তো খালি পরামর্শ করো ! সেই যে সেদিন রাত্তির বেলা কাঁ্যাকড়া রান্না করলে, কই, পান্নাকে একবার বলেছিলে সে-কথা ? ও কোথা থেকে কী-সব খেয়ে এসে সারা রাত উপোসই করে রইলো।

আভা না বলিয়া পারিল না : খেয়ে এলে আবার উপোস করে থাকে কী করে ?

—তা তো পারে না জানি, কিন্তু তুমি বলেছিলে একবার ? কাঁ্যাকড়া খেতে ও কতো ভালোবাসে।

পান্নালাল বলিল : কী যে বলো, মা। কতো সব বৃহৎ-বৃহৎ প্রাণী ভক্ষণ করে এলাম ; তার কাছে কীটাণুকীট এই কাঁ্যাকড়া ! আমার

পছন্দ যে এতোটা নেমে যায়নি সেটা বৌদি জানতে পেরেছে বলে তার পছন্দকেই তারিফ করছি। আর আমি মা, সর্বভুক। যাই বৌদি রাঁধতে দেয়, তাইতেই যে কি করে আমার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়, সেইটেই আমাকে অবাক করে।

রাজলক্ষ্মী নিচে সেই রান্না তদারক করিতে আসিল। পান্নালাল নিজে হইতে খাইতে চাহিয়াছে বলিয়াই সে সহসা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে এবং মাছের ঘরের সমস্ত সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসিলেও আভার এই ব্যাপারে আজ কতোখানি অবহেলা বা শৈথিল্য হইতেছে তাহাও তাহার খুঁটিয়া-খুঁটিয়া দেখা দরকার। কেননা পান্নালালের ফরমায়েসে কি তাহার ততো গা হইবে? চাকর বাজার আনিয়াছে, সিঁড়ির একটা ধাপে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহাই দেখিতে লাগিল। মাছগুলি মোটেই আশানুরূপ বড়ো হয় নাই—রঙ্গলালের নিজে বাজারে যাইতে কী হইয়াছিল! না, বাজারে কী সে যায়, বৌ একবার বলিলে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিত নাকি? তা, বৌ বলিবে কেন?

চাকর বলিতেছে, ইহার চেয়ে বড়ো মাছ বাজারে আজ উঠেই নাই—আনিবে কোথা হইতে? ইহারাই বা আকারে কম কিসে, —চার-চারটিতে একেক সের করিয়া ওজন। চোদ্দ আনা করিয়া সের।

—তুই তো তা বলবিই। রাজলক্ষ্মী চাকরকে ধমকাইয়া উঠিল: তোকে যা শিখিয়ে দেবে তাই তো বলবি। ব্যাটা আবার পয়সার

হিসেব দিতে এসেছে ? সেদিন বৌর জন্মদিনে রঙ্গ যে চিংড়ি মাছ আনলো, তার সের পাঁচ-সিকে করে ছিলো না ? ছোটো দেখে আনতে বলে দিলে তুই কী করবি ? তোর কী দোষ ? নে, কুটে ফেল চট করে। ও ঠাকুর, একটু ভালো করে রেঁধো যেন—কারু কথায় পড়ে যা-তা গুচ্ছের ঝাল দিয়ে বসো না।

আঁচলের খুঁটে বাজারের ফিরতি পয়সা বাঁধিয়া আভা উপরে উঠিতে যাইতেছিল, ইচ্ছা ছিলো পান্নালালকে একবার নিচে পাঠাইয়া দেয়, মাছগুলির কাটলেট হইবার যোগ্যতা আছে কি না সে নিজে আসিয়া দেখিয়া যাক। কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে কথাটা কী করিয়া পড়িবে ভাবিতেই তাহার ভারি হাসি পাইল। তবু, উপরে উঠা দরকার, পয়সাগুলি বাক্সে রাখিয়া আসিবে—ভারি আঁচলে কাজ করিতে সুবিধা হইবে না।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখিয়াছে, মাসিমা টিপ্পনি কাটিলেন : ঐ চললো রঙ্গর কাছে নালিশ করতে।

রাজলক্ষ্মী বলিল : ঐ তো জানে। সাত-জন্মে এমন লাগানে মেয়ে দেখিনি কখনো।

আভার ইচ্ছা হইল বলে, উনি নিচের ঘরে বসিয়া আপিসের কি কাগজ-পত্র ঘাঁটিতেছেন, কিন্তু রান্নাবান্নার মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার এই খবর রাখাটা শাশুড়িদের চোখে শোভন ঠেকিবে না। তাই সে কোনো দিকে না চাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর বসিবার ধাপের কাছে আসিয়া সে থামিয়া পড়িল।

তাহার পার হইবার এখনো যথেষ্ট জায়গা আছে বটে, তবু রাজলক্ষ্মী কিছুতেই সংকুচিত হইল না বলিয়া সে বলিল : একটু সরুন, আমি যাবো।

রাজলক্ষ্মী কহিল : যাও না, তোমাকে কে ধরে রাখছে ?

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া, শরীরের চার পাশে শাড়িটা সংযত করিয়া, অতি সন্তর্পণে, চোরের চেয়েও ভয়ে-ভয়ে আভা অতি কষ্টে সে-ধাপটা পার হইল।

পরের ধাপে উঠিয়া সে শাড়িটাকে ছাড়িয়া দিয়া শরীরটাকে সবে একটুখানি বিস্তৃত করিয়াছে, অমনি রাজলক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল : দেখলে, দেখলে দিদি, বৌ কেমন একটা আমাকে লাথি মেরে গেলো ?

আভার পা দুইটা পাথর হইয়া গেলো, শরীরে কোথাও একটুও বশ রহিল না। তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়া কহিল : ও-মা কই আমার পা ঠেকলো ? আঁচলটা গুটিয়ে ধার দিয়ে কোনো রকমে উঠে গেলাম, বলে কি না—

রাজলক্ষ্মী আর কোনো কথা না বলিয়া আঁচলের তলায় মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল। মাসিমা চেঁচাইয়া কহিলেন : একবার দেখে যা রঙ্গলাল, তোর বৌর কীর্তিখানা একবার দেখে যা।

রঙ্গলাল তাহার বৈঠকখানা হইতে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপারটার কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। দেখিল আঁচলে মুখ চাপিয়া মা বসিয়া আছে, আর দুই ধাপ উপরে আভা নামিবে, না, উঠিবে,

কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। রঙ্গলাল বিরক্ত, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল : কী, কী হলো আবার ?

মাসিমা কহিলেন : এই ছ্যাখ না তোর বৌর কাণ্ড। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় পা দিয়ে তোর মাকে এক ঠোক্কর মেরে গেলো।

—মিথ্যা কথা। আভাও সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। ককখনো গায়ে তাঁর আমার পা লাগেনি। আমার আঁচল পর্যন্ত লাগেনি।

রাজলক্ষ্মী মুখ হইতে আঁচল সরাইয়া কহিল : মুখ খসে পড়বে। সেই পান্না হু'খানা কাটলেট খেতে চেয়েছে, তাতেই ওর চোখ-মুখ অন্ধকার হয়ে গেলো। কী তুমদাম করে চলা, কী গজগজানি। আমি এইখেনে বসে আছি, আমার মাথা ডিঙিয়ে যাবার ওর কী হয়েছিলো! তারপর দিদিকে কিনা মিথ্যুক বলা!

মাসিমা ফোড়ন দিলেন : কতো কী কী বলে—মুখে ওর কিছু বাধে নাকি? হাঁ করে ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী, রঙ্গ? আজ শাশুড়িকে লাথি মারলো, কাল তোকে মারবে।

রঙ্গলাল কী করিবে, একেবারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আভা বলিল : আপনিই তো আমাকে এখান দিয়ে তখন যেতে বললেন, আপনাকে বলেই তো পাশ কাটিয়ে গেলাম—

রাজলক্ষ্মী গর্জন করিয়া উঠিল : তাই যাবার সময় একটু চন্নামৃত দিয়ে গেলে—

উত্তরে আভা আবার কী বলিতে যাইতেছিল, রঙ্গলাল তাহার

মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিল : শিগগির নেমে এসো বলছি। এক্ষুনি এসে মাকে প্রণাম করে তাঁর ক্ষমা চাও।

সেই প্রবল কণ্ঠের কাছে সবাই এক মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেলো। আভা রেলিঙ ধরিয়া এই নিদারুণ শব্দের আঘাতটা সামলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রঙ্গলাল আবার গর্জন করিল : নেমে এলে ? এসো। মা'র পা ধরে ক্ষমা চাও এক্ষুনি। চাও। নইলে ভালো হবে না বলছি।

আভার চোখ-মুখ তাতিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সে রাজলক্ষ্মীর পাশ কাটাইয়া তাহার সামনে, পরের ধাপটায় নামিয়া আসিল। শাশুড়ির সামনে নত হইয়া সে কহিল : গুরুজনকে প্রণাম করতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যে-দোষ আমি করিনি, তার জন্যে আমি ককখনো ক্ষমা চাইতে পারবো না। এবং বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রাজলক্ষ্মীর পা স্পর্শ করিয়া আবার উঠিয়া গেলো।

রঙ্গলাল বলিল : দাঁড়াও।

আভা থামিয়া পড়িল।

—তোমার ক্ষমা চাইতে হবে।

আভা বলিল : কেন ? ওঁর গায়ে যখন আমার পা লাগেনি, তখন কেন আমি ক্ষমা চাইতে যাবো ? এই তো উঠে এলাম, পা লাগতে পারে কখনো ?

রাগে রঙ্গলালের সমস্ত হাত-পা কঠিন হইয়া আসিল। আভার এই দুর্বিনীত, নির্লজ্জ ব্যবহার সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে

না। ক্ষমা চাহিলে তাহার কী ক্ষতি হয়। কিন্তু কিছু বলিবার আগে রাজলক্ষ্মী তাহার জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রুক্ষ কণ্ঠে কহিল: তুমি লাগাও নি পা ইচ্ছে করে। আমি মিথ্যে কথা বলছি? দিদি দেখেনি ওখান থেকে?

দিদি পাশের ঘরের দরজার সামনে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, বঁটি ফেলিয়া তিনিও উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন: দেখলাম বৈ কি।

আভা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল: আপনি ওখান থেকে দেখতেই পারেন না। আর আমিও কখনো মিথ্যা বলি নি। গলা বড়ো করে বললেই তা সত্য হবে না।

রাজলক্ষ্মী রঙ্গলালের দিকে চাহিয়া বলিল: আমি মিথ্যাবাদী। আর তুই তোর বৌকেই বিশ্বাস করছিস

—ককখনো না। ও-ই মিথ্যা বলছে। আমি জানি ওকে। বলিয়া রঙ্গলাল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিল। কহিল: শিগগির ভালো করে মা'র পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও এক্ষুনি।

—আমি মিথ্যে বলছি? আভা দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ করিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।

—নিশ্চয়। তোমার মতো ছোটো, নীচ, নির্লজ্জ কেউ আছে নাকি? শিগগির যাও, এখুনি আমার কথা শোন। মা ককখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তোমাকে আমি জানি না? যাও!

আভা তবু চিত্রার্পিতের মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যথিত

কণ্ঠে কহিল : প্রণাম তো একবার করলাম—আবার কী! আমি যখন মিথ্যা বলিনি, তখন তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইতে পারবো না। বলিয়া সে চোখ নামাইয়া আঙুল খুঁটিতে লাগিল।

রঙ্গলালের সমস্ত প্রভুত্ব গর্ব হঠাৎ এক নিমেষে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেলো। নির্মম, পরুষকণ্ঠে কহিল : তবে তুমি আমার সামনে থেকে বেরোও। তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না বুঝলে? যে আমার মাকে এমন অসম্মান করতে সাহস পায়, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এখনো সময় আছে, এখনো তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।

—ককখনো না। বলিয়া আভা আঁচল ও ঘোমটা না সামলাইয়াই দোতলায় উঠিয়া গেলো।

আর রঙ্গলাল কিনা ইহার পর কিছুই না করিয়া গম্ভীর মুখে আবার তেমনি নামিয়া আসিয়াছে। মা ও মাসিমার কাহারো মুখের দিকে সে তাকাইল না, একটিও কথা না বলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলো।

রঙ্গলাল বুদ্ধিমানের মতো আভার পক্ষে ব্যাপারটা খুবই সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। মাত্র একটা ক্ষমা চাওয়া। তাহা হইলেই রাজলক্ষ্মীর জ্বালাটা কিঞ্চিৎ মিটিত বটে। কিন্তু স্বামীকেও যখন এইরূপ অমান্য করিতে পারিল, তখন রঙ্গলালের উচিত ছিলো তাহার পিঠে দুই ঘা বসাইয়া দেওয়া। লাথি দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া। তাহা না করিয়া সে

কিনা তাহার সমস্ত অধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া মুখ ম্লান করিয়া নামিয়া আসিল। অন্য ছেলে হইলে কি এই অমানুষিক অপমান সহ্য করিত নাকি?

ঘণ্টা দুই পরে রঙ্গলাল যখন বাড়ি ফিরিল, দেখিল সমস্ত উপর-নিচ কেমন যেন থমথম করিতেছে। নিচে রান্না-বান্না সব ছিটানো, কাহারো খাওয়া হয় নাই, এখানে সেখানে কোটা তরকারি পড়িয়া আছে। কিছু একটা বিভীষিকার সন্দেহ করিয়া রঙ্গলালের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার পর্যন্ত সামর্থ্য রহিল না। রাজলক্ষ্মী রঙ্গলালকে রাস্তা দিয়া আসিতে দেখিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিল, রঙ্গলাল তাহার দিকে ভীত, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাইতেই সে কহিল: এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে, রঙ্গ।

রঙ্গলালের জিভ শুকাইয়া মাথা ঘুরিয়া উঠিল: কী?

—আর কী? যা তোর বউ, জাঁহাবাজ, বোম্বেটে মেয়ে। গোঁয়ারতুমির কি আর শেষ আছে? কোনো শাসনে কখনো মানে? শাশুড়ি বল, সোয়ামি বল—

রঙ্গলাল উদ্ভ্রান্তের মতো কহিল: কী, কী করেছে সে?

—কী আবার করবে? কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

—বেরিয়ে গেছে? রঙ্গলাল কতকটা যেন তবু আশ্বস্ত হইল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম, কোথাও নেই। এদিকে সেই ফুল-তোলা নাগরা-জোড়া নেই, আলনার ওপর সেই মাদ্রাজি চাদরটা খুঁজে পাচ্ছি না। নলিনী ওকে খানিক

আগে সাজতে দেখেছে। ভয়ে কারো কিছু জিগগেস করবার সাধ্যি আছে নাকি ?

রঙ্গলাল জিজ্ঞাসা করিল : একা-একা বেরিয়ে গেলো ?

রাজলক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া কহিল : কে জানে ? আর কারো সঙ্গে ষড় করে বেরিয়ে গেলো কিনা তারই বা ঠিক কী ? এ যে তোর লেখা-পড়া-জানা বৌ। ধরা-ছোঁয়ার জো নেই। তা, হতচ্ছাড়ি যেমন একবার এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, আর এ-বাড়িতে ঢুকতে পাবে না। কী সাহস ! কী তেজ ! সটান বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো !

রঙ্গলাল মনে-মনে সমস্ত জনারণ্য খুঁজিয়া আসিয়া কহিল : কিন্তু কোথায় ও যাবে ?

—তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বসেছে ? পান্নাটা যেমন উজবুক, খবর পেয়ে তক্ষুনি খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় ওকে পাবে শুনি ? তলে-তলে ওর বদমাইসি, বেরিয়ে যাওয়াই ওর মতলব। রাস্তা-ঘাট সব যে ওকে তুই চিনিয়ে দিয়েছিস। কার সঙ্গে কখন কী বন্দোবস্ত করে রেখেছে—

রঙ্গলাল ধমক দিয়া উঠিল : বাজে কথা কেন বলছ ? কিন্তু বাড়ি-ঘর ভালো করে খুঁজে দেখেছ তো ? কোথাও বিষ-টিষ খেয়ে পড়ে নেই তো ?

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল : সেদিকে মেয়ে ভারি সেয়ানা। সোজা পথ সে মাড়াবে না। লেখা-পড়া শিখেছে যে। পেটে-পেটে যে অনেক বুদ্ধি।

রঙ্গলাল উপরে তাহার শোবার ঘরে উঠিয়া আসিল। ঘরের চেহারা দেখিয়াই কেমন তাহার মনে হইল আভা চলিয়া গিয়াছে। আলনাটার একটা জায়গায় ফাঁক, জুতা এক-জোড়া কম, যাইবার আগে চুলটা যে একটু আঁচড়াইয়াছে চিরুনিতে তাহার চিহ্ন, চিরুনির মুখে সদ্য সিঁদুর লাগাইবার স্পষ্ট আভাস। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটা একটু বাঁকানো, যাইবার আগে সামান্য একটু প্রসাধন করিয়া নিতে সে ভোলে নাই। পথের লোকের অহৈতুক সন্দেহ এড়াইবার জন্য তাহার রুক্ষতাকে মার্জিত করিয়া নিয়াছে। ড্রয়ারটা ধরিয়া রঙ্গলাল টান দিলো। তাহার বাক্-স্কিনের সেই মনিব্যাগটা এখানে ছিলো—সেটাও সে নিয়া গিয়াছে, এবং তাহার উদর পুরণ করিয়া নিতেও সে কৃপণতা করে নাই। এমন দুঃখের মুহূর্তেও সে এতো প্র্যাক্‌টিক্যাল। কিছু টাকা না নিলে তাহার চলিবে কী করিয়া ?

নিচে পান্নালালের গলার আওয়াজ পাইয়া রঙ্গলাল তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল : কী, কিছু খোঁজ পেলি ? রুমালে কপালের ও বুকের ঘাম মুছিতে-মুছিতে পান্নালাল কহিল : নিশ্চয় পেলাম। যা ভেবেছিলাম, তাই ; বাপের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে। গিয়ে দেখি, বৌদি রান্নাঘরে তার ভাই-বোনদের সঙ্গে দিব্যি ভাত খেতে বসেছে। আমাকে দেখে কী হাসি !

রঙ্গলাল বলিল : তুই কী বললি ?

—কতো সাধ্যসাধনা করতে লাগলাম, কিছুতেই এলো না।
রাজলক্ষ্মী দাঁত খিচাইয়া উঠিল : তোকে সাধ্যসাধনা করতে কে বলেছিলো ? যে একা-একা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়, তাকে আবার সোহাগ দেখানো ! এলো না ! আসতে ওকে কে দিচ্ছে ?
মাসিমা টিপ্পনি কাটিলেন : সব তাতেই ওর বাড়াবাড়ি। একেবারে খোঁজ না নিয়ে এলে ওর চলতো না !
রঙ্গলাল জিজ্ঞাসা করিল : তারপর ?
পান্নালাল হাসিয়া বলিল : তারপর আর কী ! আমাকে বৌদি খেয়ে যেতে বললে। দিব্যি মোচার চপ রেঁধেছে দেখলাম। না খেয়ে আর করি কী বলো ?
রাজলক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল : ঐ বাড়িতে তুই ভাত খেয়ে এলি ? নেমন্তন্ন করলো না, কিছু না, খেতে তোর লজ্জা করল না ?
—হ্যাঁ, লজ্জা করতে গেলেই হয়েছিলো। এদিকে বাড়িতে কখন কী রান্না হয় কিছু ঠিক নেই। এক চিংড়ির কাটলেট খেতে চেয়েছিলাম বলে তো এই কাণ্ড। এগারোটা বাজে। ওদিকে টাটাকা ভাজা মোচার চপগুলিও ছেড়ে দিয়ে আসি আর কি ! খিদে আগে, না, নেমন্তন্ন আগে ? বলিয়া পান্নালাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দশ

রঙ্গলাল ভাবিয়াছিল আভা বেশি দিন এই স্বেচ্ছা-আরোপিত বিচ্ছেদের নির্বাসন সহ্য করিতে পারিবে না, সজল চক্ষে ক্ষমাপ্রার্থিনীর বিনীত ভঙ্গিতে আসিয়া এক দিন উপস্থিত হইবে। কিন্তু তিন মাস কাটিয়া গেলো, তবু তাহার ঔদ্ধত্যের এতোটুকু নড়চড় হইল না।

সেই নাটকীয় ঘটনার পর দিনই অবশ্য তাহার বাবা রাজেন্দ্রবাবু আসিয়াছিলেন। তিনি মেয়ের হইয়া বেয়ান-ঠাকরুনের কাছে অনেক ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু সেই ক্ষমা চাওয়াইবার জন্য মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারিলেন না। রঙ্গলাল স্পষ্ট বুঝিল আভা তাহার দৃপ্ত ভঙ্গিটা কিছুতেই এতোটুকু অবনত করিবে না। মনে-মনে সে নিদারুণ চটিয়া রহিল।

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন: অল্প বয়সেই ওর মা মারা যাওয়াতে সে-দিক দিয়ে শিক্ষা ওর সম্পূর্ণ হয়নি। আপনিই ওর মাতৃস্থানীয়া—ওর দোষ-অপরাধ ক্ষমা করে না নিলে—

রাজলক্ষ্মী কর্কশ স্বরে কহিল: শিক্ষা হয় নি কী? উঠতে-বসতে

ছোবল মারে, চিমটি মেরে কথা কয়—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।
—কিন্তু আপনারই তো পুত্রবধূ।
—রাখুন সে-কথা। পুত্রবধূ বলেই তো বলছি। বেশি কথা বাড়িয়ে কিছু লাভ নেই, বেয়াই মশাই। আমার বৌ যখন একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন এ-বাড়ির দরজাও তার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেছে জানবেন। আমার ঐ এক কথা।
রাজেন্দ্রবাবু রঙ্গলালের দিকে চাহিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন : তুমি বাবা, কী বলো ?
রঙ্গলাল রূঢ়স্বরে বলিল : আমি আবার কী বলবো ? মা'র ওপর আমার আবার কোনো কথা আছে নাকি ?
রাজলক্ষ্মী গর্বের হাসি হাসিয়া তাহার নির্লজ্জ তীক্ষ্ণতায় রাজেন্দ্রবাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলো। রঙ্গলালের দিকে এমন ভাবে তাকাইল যে বেয়াই-মশাই তাহার ছেলেকে একটা যা-তা যেন না ঠাওরান। সে মায়ের বুকের দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছে।
রাজেন্দ্রবাবু আবার কাকুতি করিয়া কহিলেন : কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হলে সে কোথায় যাবে, বাবা ?
কথাটার উত্তর শুনিবার জন্য রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণ চোখে রঙ্গলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেই দৃষ্টির প্ররোচনায় উদ্দীপ্ত হইয়া রঙ্গলাল বলিল : তাকে যেতেই বা কে বলেছিলো ? আর যখন সে একবার সবাইর মুখের ওপর দিয়ে এমন করে চলে যেতে পারলো, তখন তার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক ?

রাজেন্দ্রবাবু আবার মুখ কাঁচুমাচু করিয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন : তাকে, বাবা কিছুতেই আমি এখানে টেনে আনতে পারছি না। তুমি যদি একবারটি আমাদের ওখানে যাও, তবে অনায়াসেই ওকে ঠাণ্ডা করতে পারো । তোমাদের জিনিস, অধিকারো তোমাদের।

রঙ্গলাল এইবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল : অধিকার যে আমাদের তা আমরা জানি এবং সে-অধিকার কী করে খাটাতে হয় তা কারো কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না।

রাজলক্ষ্মী বেয়াই-মশাইর দিকে কুটিল ভ্রূভঙ্গি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইহার পর আরো তিন-চার বার রাজেন্দ্রবাবু মিনতি করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু আভার আসিবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই ; মা-ও বারে-বারে তাহার সেই এক কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। মা ও আভা কেহই একচুল বিচ্যুত হইতেছে না। মাঝখানে পড়িয়া রঙ্গলালই হাঁপাইয়া উঠিল।

গোড়ায়-গোড়ায় সে দুর্নিবার রোষে তাহার সমস্ত শরীর-মন কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যতোই দিন যাইতে লাগিল, ততোই তাহার সমস্ত কর্ম ও অবকাশ উদাসীন শূন্যতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু স্নেহে যদি সে অকৃপণ, নিষ্ঠুরতায়ও সে বলিষ্ঠ। আভার কিসের এই অহঙ্কার! কিসের মূল্যে সে এই বিরহের বিলাস সম্ভোগ করিতেছে? উচ্ছৃঙ্খল হঠকারিতায় এখনো সে

তাহার মর্যাদা বুঝিল না, সামান্য একটা ক্ষমা চাহিলেই তাহার জীবনের সমস্ত সত্য যেন নিষ্প্রভ হইয়া যাইত।

আভার এই অশোভন বিদ্রোহ রঙ্গলালের মনে দিনে-রাত্রে তীব্র চাবুক মারিতে লাগিল। এমন করিয়াই তাহাকে সে অস্বীকার করিবে? অথচ তাহার আসিবার পথ সে কতো প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। মৌখিক একটা ক্ষমা চাহিবার পরিবর্তে এই দূরে সরিয়া দাঁড়ানোই তাহার কাছে সহজ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে তাহার জন্য তাহাকে যেন কোনো দিন অনুতাপ করিতে হইবে না! আভা যে শেষ পর্যন্ত এতো বোকাই রহিয়া যাইবে তাহা রঙ্গলাল বিশ্বাস করিতে পারিত না। সে ভাবিয়াছে কী? যেন রঙ্গলালের কিছুই করিবার নাই—মুখ বুজিয়া তাহাকে সকল অসৌজন্য সহ্য করিতে হইবে।

প্রতিশোধ নিতে রঙ্গলাল কী করিতে পারে, ভাবিতে গিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল।

কিন্তু—ইহাও ভাবিতে-ভাবিতে রঙ্গলাল অস্থির হইয়া উঠে—সেই-বা কিসের জন্য এই ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে এমন অপূর্ণ, হতশ্রী করিয়া রাখিতেছে? জীবনে কোথায় তবে তাহার মূল্য রহিল? যে-প্রেমের জন্য এতো দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছিলো, তাহার এই মূর্তিময় আবির্ভাবকে সে কেন বরণ করিয়া নিবে না? জীবনে কোন মহত্তর স্বার্থের লোভে তার এই প্রায়োপবেশন! এ তপস্যা নয়, এ মাত্র একটা ঘটনা। সামান্য

একটা ঘটনায় সেই বা কেন জীবনকে এমন কৃত্রিম, এমন অসত্য, এমন ভিন্নগামী করিয়া তুলিবে? প্রেমের কাছে কিসের তাহার সংসার, কিসের সামঞ্জস্য, কিসের লোকলজ্জা! সেই বা কেন আভাকে নিয়া আসিতেছে না?

কিন্তু, না, মূর্খ মেয়েটার জন্য মায়া করিয়া লাভ নাই।

বাপ তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য কতো সাধ্য-সাধনা করিতেছেন, তবু তাহার এতোটুকু গোঁ কমিল না। কী অবাধ্য, কী দুর্বিনীত! রঙ্গলালই যেন গিয়া তাহাকে পায়ে ধরিয়া গাড়ি করিয়া বাড়ি লইয়া আসিবে! যতো দায় যেন তাহারই একলার পড়িয়াছে। এই কথা যখন আবার মনে হয়, রঙ্গলালের সমস্ত শরীর ক্ষোভে ও অভিমানে কঠিন হইয়া উঠে। একটা দুর্দান্ত কিছু ঘটনা ঘটাইয়া আভার এই ঔদ্ধত্যকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে ইচ্ছা করে।

রাজলক্ষ্মী আবার তাহার হারানো জায়গা ফিরিয়া পাইয়াছে—অর্থাৎ রঙ্গলালের অর্থের আর এতোটুকু অপব্যয় হইতেছে না। খাদ্যদ্রব্যের মশলা ও ঝালের পরিমাণ কমিতেছে, তাহার প্রার্থী আত্মীয়-স্বজনের ভাণ্ডারে গিয়া কিছু অর্থ জমা হইতেছে, তাহার হাত হইতে একটা-একটা করিয়া আভার চায়ের বাসন-কোসন-গুলি মেঝের উপর খসিয়া-খসিয়া পড়িতেছে। মাসিমা ও তাহাতে মিলিয়া এখানে-সেখানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেছেন, আর নলিনী এই সুযোগে দুই হাতে খাবলা মারিয়া-মারিয়া আভার

স্নোর বাটিগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেছে। পায়ে জুতা সামান্য বড় হইলেও তাহার কিছু আসে যায় না, এবং এক দিন আভার সেই কেশোরাম-মিলের রঙিন শাড়িখানি পরিয়া সে তো রঙ্গলালকে দস্তুরমতো চমকাইয়াই দিয়াছিল।

একদিন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পান্নালালকে সে জিজ্ঞাসা করিল : তোর না সেদিন গড়পারের দিকে কোথায় দরকার পড়েছিলো—গিয়েছিলি নাকি ?

লজ্জিত হইয়া পান্নালাল কহিল : না, যেতে পারিনি। যাবো এক দিন ?

--কোথায় ? না, না, কী দরকার ? তুইও যেমন।

কিন্তু দরকার যে কতো, তাহা পান্নালাল সহজেই বুঝিয়াছে। তাই সে এক দিন গড়পারের দিকটা ঘুরিয়া আসিয়া রঙ্গলালকে নিভৃতে পাইয়া কহিল : বৌদিদিদের ওখানে গিয়েছিলাম, দাদা। বৌদিদি ভালোই আছেন।

রঙ্গলাল সমস্ত শরীর শ্রুতিমান করিয়া রাখিলেও ভঙ্গিটা এমন নিষ্ঠুর, নির্লিপ্ত করিয়া রাখিল, যেন এই সব খবরে তাহার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই।

মাত্র এইটুকু কথা। এইটুকু কথা বলিয়াই পান্নালাল অদৃশ্য হইয়া গেছে।

নিশ্চয়—আরো অনেক কথা হইয়াছিল। সেই সব আভার ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক—সেই সব গর্বসূচক, অবমাননাকর কথা

পান্নালাল দাদাকে বলিতে পারে না। পান্নালাল নিশ্চয়ই তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য বারে-বারে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কান দিতে গেলে যেন তাহার সতীত্বহানির কলঙ্ক লাগিত। ঐটুকুর বেশি বলিয়া দিবার তাহার কথা নাই। এতো অহঙ্কার তাহার কেন? যাহার রূপ নাই অর্থবল নাই, বিদ্যাবুদ্ধির ইহাই যার নমুনা, স্বামীকে যে বিমুখ করিয়া আসিল—কিসের জোরে সে এতো অহঙ্কার করিতেছে! ছি, ছি, সে কিনা আবার তাহার খোঁজ নিতে পান্নাকে পাঠাইয়াছিল! কই, সে তো এক দিন সামান্য একখানা পোস্টকার্ডও লিখিল না।

লিখিবেই বা কেন? রঙ্গলালের জন্য তাহার এতোটুকু মায়া আছে নাকি? অসুখে পড়িয়া আছে শুনিলেও হয়তো একটিবার দেখিতে আসিবে না। তাহার জন্য অসুখ হইবার কথা মনে হইলেও রঙ্গলালের ভীষণ লজ্জা করে। আভা হয়তো ভাবিবে রঙ্গলাল অসহায় অবস্থায় পড়িয়া এখন তাহাকে ভিক্ষা করিতেছে। ভিক্ষা নয়, অধিকার। ইহা বোধ হয় আভার মনে নাই। এই অধিকারের প্রমত্ত অহঙ্কারে সে তাহার কী সর্বনাশ করিতে পারে, আভা নিতান্ত অন্ধ, তাই তাহা সে দেখিতে পাইতেছে না।

কিন্তু লজ্জার সেইখানেই শেষ ছিলো না। রঙ্গলালও কিনা নিজে এক দিন গড়পারের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাড়ির সদর দেওয়া, উনুনে সবে আগুন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রচুর ধোঁয়ায় গলিটা আচ্ছন্ন—ভিতরে

কতকগুলি শিশুর সানন্দ কলকণ্ঠ স্পষ্ট শোনা গেলো। রঙ্গলাল ইতি-উতি চাহিয়াও কাহারো এতোটুকু আভাস পাইল না। বা, এইদিকে বেড়াইতে-বেড়াইতে আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র। এই গলিটা পার হইলেই সে বড়ো রাস্তায় পড়িবে। তাহার বন্ধু হরিহরের বাসাও তো এই পাড়ায়। তাহার সঙ্গে দেখা করিতেই সে আসিয়াছিল।

সে স্বামী,সে তাহার প্রভুত্ববোধকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারেনা। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিছানায় শুইয়া-শুইয়া সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অত্যন্ত গর্হিত, অত্যন্ত লজ্জাকর মনে হইতে লাগিল। ছি, ছি, কোনো ঘুলঘুলির ফাঁকে আভা তাহাকে লুকাইয়া দেখিয়া থাকিলে সে নিজেই তো তাহার এই দুর্বলতাকে মনে-মনে বিদ্রূপ করিবে। সে নিজে অতোটুকু টলিল না, আর রঙ্গলাল কিনা উলটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাধিয়া ক্ষমা চাহিতে গেলো? কিন্তু গেলেই বা কী ক্ষতি হইত? আর, যখন একবার মনের টানে সেখানে সে গিয়াছিলই, আরো দুর্বল হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল না কেন? কিসের জন্য তাহাকে সে দূরে থাকিতে দিতেছে? কেন সে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া আসিল না? কেন সে তাহাকে লইয়া এই সংকীর্ণ সংসারের প্রান্ত হইতে চুপি-চুপি পলাইয়া গেলো না? আভার চেয়ে কাহাকে সে বেশি মূল্য দিতেছে—এবং সেই মূল্যে সংসারে সে কী লাভ করিল।

রঙ্গলাল মনে-মনে হাসিল, সে কিনা এতো সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিতে যাইতেছিল? ভাগ্যিস সে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে নাই। সে স্বামী, সে প্রভু, তাহার দীনতা সমাজ বা সংসার কেহই সমর্থন করিবে না।

বারান্দায় বসিয়া রাজলক্ষ্মী আর দিদি কথা কহিতেছিলেন। তাহারই কয়েকটা টুকরা রঙ্গলালের কানে আসিতেছে; রাজলক্ষ্মী বলিল: যাই বলো দিদি, রঙ্গ কি আমার তেমন ছেলে? এতোদিন ওর খপ্পরে ছিলো বলে যা একটু বিগড়েছিলো, নইলে ও আমার সেই রঙ্গই আছে, দিদি। মাকে অশ্রদ্ধা করতে জানে না।

দিদি সায় দিলেন: সোনার টুকরো ছেলে। কিন্তু বৌটার যাবার পর থেকেই মন কেমন উড়ু-উড়ু। তেমন সকাল-সকাল আর বাড়ি ফেরে না, মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই।

—বা, আমার সঙ্গে তো সারাক্ষণই কথা বলে। তা, এমন দাগা দিয়ে বেরিয়ে গেলে মনে একটু না লেগে পারে? তা, দেখলে তো কেমন ছেলে, কর্তব্য থেকে একচুল নড়লো না। অন্য সব তোমার আজকালকার বৌ-ঘেঁষা ছেলে হলে তখুনি আঁচল ধরতে ছুটতো। গর্ব করিনে দিদি, কিন্তু ছেলেদের আমি মানুষ করেছিলাম।

ইহাতেও দিদির সায় আছে: তা যা বলেছিস। মা'র সম্মানের জন্য ছেলের এই ধর্ম্মজ্ঞান কই আজকাল আর দেখা যায়!

রাজলক্ষ্মী বলিল: ছেলের মন উড়ু-উড়ু কেনই বা হবে না বলো?

বয়েসটাই বা ওর কতো? আমি শিগগিরই তার ব্যবস্থা করছি, দিদি। ও-ভূত যে কাঁধ থেকে নেমেছে তাই ভগবানের আশীর্বাদ।
দিদি ঘাড় নাড়িলেন : হ্যাঁ, পুরুষমানুষের আবার ভাবনা!

এগারো

তারপর এক দিন রাজলক্ষ্মী ফাঁক-ফিকির সন্ধান করিয়া কথাটা রঙ্গলালের কাছে পাড়িয়া বসিল।

বলিল: তোর এই শুকনো মুখ আমি আর দেখতে পারি না, রঙ্গ। আমি এবার তোকে একটি ঘর-আলো-করা মেয়ে এনে দিচ্ছি। নিজে বাছতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিটাই হলো। এবার আমার ওপর ছেড়ে দে, আমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোর কে আছে?

রঙ্গলাল মার মুখের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: এবার আর তোর লেখা-পড়া-জানা বিবি বৌ নয়, দিব্যি ছয়ছোট্ট গাঁয়ের মেয়ে—লক্ষ্মীশ্রী। দিব্যি মনের মতো করে গড়ে নিতে পারবো।

মাসিমা ফোড়ন দিলেন: পাত্রীও প্রায় ঠিক আছে। আমাদের তেওটিয়া গ্রামেরই হরিনাথ মিত্তিরের মেয়ে। আমাদের দেখা। এখন নিশ্চয় আরো সুন্দর হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল: কি, মত আছে তো তোর?

এক কথায় রঙ্গলাল সম্মতি দিয়া বসিল: নিশ্চয়। তোমার মুখের

ওপর আমি আর কখনো কথা বলবো নাকি ? যা তুমি ভালো বোঝ, তাই করবে।

রাজলক্ষ্মী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দিদির দিকে সগর্বে চাহিয়া কহিল : রঙ্গর মতো কটা ছেলে পৃথিবীতে তুমি দেখেছ, দিদি ?

রঙ্গলাল বলিল : কিন্তু সতীনের ঘরে দিতে ওদের আপত্তি হবে না তো ?

—কিসের সতীন ? সে তো আর ঘর করতে আসছে না। যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সেই ভ্রষ্টাকে কে স্থান দিচ্ছে ? আমি ভাবছি কী জানিস, রঙ্গ ?

—কী ?

—দিদিকে নিয়ে আমি একবার গাঁয়ে যাই। হরিনাথের মেয়ে হয়, ভালো, নইলে আরো দুটো-চারটে দেখে-শুনে আসি।

রঙ্গলাল বলিল : মন্দ কী !

মাসিমা কথাটা বিশদ করিলেন : কলকাতায় যা দু'একজন দিশি লোক জানি, তারা এই ব্যাপারের পর সহজে কেউ মেয়ে দিতে রাজী হবে না। জানাজানি হতে তো কিছু বাকি নেই ? গাঁয়ে সেটা এখনো ছড়ায় নি।

—কিন্তু জানতে তো এক দিন পারবে।

—তাতে বয়ে গেলো।

রাজলক্ষ্মী কহিল : মেয়ের তো তাতে কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। অনেকে জেনেও সেধে দিতে চাইবে। এমন ছেলে পাবে কটা শুনি ?

বিয়ে করে লোকের এক দিন উপকার করবি বলছিলি না? এবারই সত্যি উপকার হবে।

রঙ্গলাল হাসিয়া বলিল : কিন্তু ভেবে দেখছি উপকার হবে সব চেয়ে বেশি আমার।

—হ্যাঁ, মা হয়ে আমি আর তোর এই কালো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। যাক গে, তেওটিয়া গিয়ে দিদির সঙ্গে শিগগিরই আমি একটা বন্দোবস্ত করে ফেলছি। তুইই নিয়ে চল না আমাদের---একেবারে তুইও দেখে-শুনে পছন্দ করে আসবি।

রঙ্গলাল গম্ভীর হইয়া কহিল : আমার এখন ছুটি কোথায়? আর, আমার পছন্দ!

রাজলক্ষ্মী বলিল : তবে অন্য কোনো একটা চলনদার দেখতে হবে। লোজঙ, কি বড়ো জোর গোয়ালন্দের স্টিমারে চাপিয়ে দিলেই চলবে, বাকি রাস্তাটা আমরা ঠিক চলে যেতে পারবো। কী বলো, দিদি?

মাসিমা সায় দিলেন : অনায়াসে। লোকই বা লাগবে কী করতে? আমাদের কাউকে কিছু বলে দিতে হবে না।

রঙ্গলাল বলিল : না, সঙ্গে একজন লোক নিতে হয় বৈ কি। সে আমি ঠিক খুঁজে বার করতে পারবো। সঙ্গে মাল-পত্র থাকবে—টাকা-কড়ি থাকবে—

—নিশ্চয়, লোক একটা দরকার হবে বৈ কি। আমরা তো আর হাল-ফ্যাশানের মেয়ে নই।

মাসিমা ঘাড় নাড়িলেন : তা বলেছিস ঠিক। তা ছাড়া রঙ্গলালের মা আর মাসি। তাদের ঐশ্বর্য কম কিসে ?

রঙ্গলাল জিজ্ঞাসা করিল : নলিনীকেও তো সঙ্গে নেবে ?

—হ্যাঁ, ওকে কোথায় রেখে যাবো ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : তবে আমার চিঠি পেয়েই ছুটির জন্যে একটা দরখাস্ত করে দিবি। যতো বেশি পাস।

রঙ্গলাল বলিল : তা, আমার মন্দ পাওনা হয় নি।

—হ্যাঁ, যেমন লিখবো সেই বুঝে ছুটি নিবি। আমি অবিশ্যি কলকাতায়ই বিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু বলা তো যায় না। হয়তো দেখবো অবস্থা ভালো নয়, কলকাতায় আসার খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে গাঁয়েই বিয়ে দিতে হবে। এবার আমি জাঁকিয়ে উৎসব করবো, রঙ্গ। ষোড়শীকে এবার ফেলতে পারবো না। এবার তো আর শাকচুন্নি ঘরে আনছি না। আর আমার লজ্জা কিসের ?

—তা, যা তুমি ভালো বোঝ, তাই করবে। গাঁয়ে হলেও আমার আপত্তি নেই। তা, কবে তোমরা যেতে চাও ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : যতো শিগগির হয়। একজন চলনদার যোগাড় করে দে। পান্নাটাও এ-সময় বাড়ি নেই—গেছেন তাদের কলেজের হয়ে দিল্লিতে ক্রিকেট খেলতে।

মাসিমা বলিলেন : ও থাকলে আমাদের নিয়ে যেতো নাকি ভেবেছ ?

—না নিয়ে গেলেও রঙ্গকে সাহায্য করতে পারতো। ধরো, তেঁওটিয়াই যদি বিয়ে হয়, তবে রঙ্গকেই একলা সব অধিবাসের জিনিস-পত্র কিনে নিয়ে যেতে হবে তো ? দু'ভাই ভাগাভাগি করে কেনাকাটা করে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারতো। না, যতো শিগগির হয়, রঙ্গ। তোর দুঃখ আমি আর দেখতে পারি না।

মাসিমা ঘাড় হেলাইয়া বলিলেন : পুরুষমানুষের আবার দুঃখ !

স্বর্গ-মর্ত মন্থন করিয়া রঙ্গলাল চলনদার যোগাড় করিয়া আনিল : আমাদের সেই বৈদ্যনাথ মা—একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম, যামিনী দত্তর ছেলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কই সে ?

—সেই তোমাদের নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল : বেশ কথা, ও এখানে চাকরি খুঁজতে এসেছিলো শুনেছিলাম। নিয়ে এলি না কেন ?

—আসবে'খন বিকেলে। চাকরি এখনো একটা পায়নি। আমিও চেষ্টা করছি। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে ও চলে আসবে। তার পর আমিই তো যাচ্ছি।

মাসিমা বলিলেন : হ্যাঁ, পরের উপকার একটু-আধটু করতে হয় বৈ কি। কী কষ্টে লেখা-পড়া শিখেছে।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তবে পাঁজি দেখে দিন একটা ঠিক কর কাছাকাছি।

রঙ্গলাল ব্যস্ত হইয়া বলিল : এর আবার দিন দেখবে কী? আজকেই বেরিয়ে পড়ো না। হাঙ্গামাটা কোথায়?

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন : ছেলের এখন যে আর তর সইছে না। দেব, দেব, রাঙা টুকটুকে বৌ এনে দেব এবার।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তা কী করে হয়? যাচ্ছি একটা শুভকর্মে, ভালো দিন বেছে রওনা হতে হবে বৈ কি।

রঙ্গলাল তক্ষুনি পাঁজি দেখিতে উঠিয়া গেলো।

দিদি বলিলেন : বাছার বুকটা একেবারে খাক করে দিয়ে গেছে। আরেকটা আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত ও টিকতে পারছে না।

দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া রাজলক্ষ্মী কহিল : খাক এবার আমি করাচ্ছি। দেমাকি এবার বুঝবেন।

আজ ভালো দিন—সন্ধ্যা হইতেই অমৃতযোগ। রাজলক্ষ্মী আর মাসিমা বাঁধা-ছাঁদা নিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আভার চুলের কাঁটাটি হইতে শূন্য কৌটো-কাপ, সাবানের বাক্স, যাহা যেখানে পাইল নলিনী কোঁচড় ভরিয়া তুলিয়া লইল। পায়ে বড়ো হইলেও জুতা-জোড়ার মায়াও সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না।

পান্নালালের ঘরটা তালাবন্ধ—চিঠি দিয়াছে শিগগিরই সে

আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীদের ঘরেও তালা পড়িল। খালি রঙ্গলালের ঘরটা খোলা। নিচে নিরিমিষ্যি ঘরেও শিকল আঁটা হইয়াছে। অতিরিক্ত বাসন-পত্র, বাক্স-ট্রাঙ্ক রাজলক্ষ্মীদের ঘরেই সম্প্রতি মজুত রহিল। পরে আবার সব তাহাদের জায়গা করিয়া দিতে হইবে।

সন্ধ্যায় রঙ্গলাল বাহির হইয়া যাইবার পরই বৈদ্যনাথ আসিয়া হাজির। খাওয়া-দাওয়া সে এখানেই সারিয়া নিলো। কিন্তু রঙ্গলাল এখনো ফিরিতেছে না। ফিরতি-মুখে তাহার ন'টার আগে একেবারে গাড়ি নিয়া আসার কথা। এখন ন'টা তো প্রায় বাজে। জিনিস-পত্রগুলি বৈঠকখানা ঘরে চাকর নামাইয়া আনিয়াছে, জলযোগ সারিয়া রাজলক্ষ্মীরা কখন হইতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এখনো তাহার ফিরিবার নাম নাই। রাজলক্ষ্মী অস্থির হইয়া বারে-বারে ঘর-বাহির করিতে লাগিল। টাকা-পয়সা অবশ্য রঙ্গলাল তাহাকে আগেই সব বুঝাইয়া দিয়াছে, টিকিটের টাকাটা আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া সেমিজের তলায় সে চালাইয়া দিয়াছে—বাকিটা তাহার পেট-কাপড়ে বাঁধা। চলিয়া যাইবার তাহার কোনো বাধা নাই, কিন্তু যাহার জন্য যাওয়া তাহার সঙ্গে দেখা না হইলে চলে কি করিয়া? তাহার উপর সে গাড়ি লইয়া ন'টার আগে আসিবে বলিয়া গিয়াছে।

খানিক পরেই সদর দরজার কাছে রাস্তায় মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। রঙ্গলালই আসিয়াছে—হ্যাঁ, স্পষ্ট রঙ্গলালের কথা শোনা

গেলো : হ্যাঁ, শেয়ালদায় যেতে হবে। ঢাকা মেইল। ঘুমা লাও।

নলিনী আহ্লাদে ডগমগ হইয়া কহিল : নতুন বৌ আসবে শুনে মামা ফুর্তি করে একেবারে মোটর নিয়ে এসেছে। ঠেসে হাওয়া খাওয়া যাবে, দিদিমা।

দিদিমা শাসনের সুরে কহিলেন : আলোয়ানটা মাথার ওপর দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে নে। যা শীত পড়েছে ক'দিন থেকে।

মোটা লুইটা গায়ের উপর ভালো করিয়া চাপাইতে চাপাইতে রাজলক্ষ্মী গদ্গদ হইয়া কহিল : আমার রঙ্গর কর্তব্যবুদ্ধি একবার দেখ, দিদি। দেরি হচ্ছিলো বলে কতো কি ভাবছিলাম, কিন্তু একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে। হু-হু করে পৌছে যাবো। বিষ্ণিনাথ কোথায় ?

রঙ্গলাল বৈঠকখানায় আসিয়া হাঁক পাড়িল : কই রে, রামা কই রে ? মালগুলি তুলে দে চট করে। ট্রাঙ্কটা আগে মাথায় চাপিয়ে দে—'বড়ো বিছানাটা ড্রাইভারের পাশে, ছোটো ট্রাঙ্কটা ওপরেই ধরবে—আরেকটু বাঁয়ে করে নে, এই ! কই তোমরা এসো। তা, বেশ সময় আছে বিষ্ণিনাথ, কী বলো ? বেশ হুঁসিয়ার হয়ে যেয়ো।

রাজলক্ষ্মী বলিতে-বলিতে আসিল : খাবারের ঝুড়িটা যেন রামা ছোঁয় না। যা নলিনী, ওটা তুই পাশে নিয়ে বস গে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়াই সে হতবাক, স্তব্ধ হইয়া গেলো। পায়ের নিচে সিমেণ্ট-করা মেঝেটা যেন কাদার মতো ডুবিয়া

যাইতেছে। দরজার পাশে কুণ্ঠিতকায়, আপাদমস্তক র‍্যাপার মণ্ডিত, নিস্পন্দ মুর্তিটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিষ্প্রাণ, শুষ্ক কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল : ও কে ?

রঙ্গলাল ব্যস্ত অথচ স্বচ্ছন্দ গলায় কহিল : ও আভা। বৌকে নিয়ে এলাম, মা। তোমরা চলে গেলে একা-একা কী করে এ বাড়িতে থাকবো ? হ্যাঁ, উঠেছে তো সব ? বদ্যিনাথকে টিকিটের টাকা বুঝিয়ে দিয়েছ তো ? ও কি আভা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? মাসিমার সঙ্গে মা তেওটিয়া বেড়াতে যাচ্ছেন। প্রণাম করো। নলিনী তো আগেভাগেই গাড়িতে উঠে বসেছে।

গাড়ির মধ্য হইতে নলিনী বলিল : এটা যে দিদিমা, বন্ধ মোটর। তোমরা উঠে এসো শিগগির। বা, বা, ভেতরে যে আবার আলো জ্বলে, দিদিমা।

আভা নিঃশব্দে নতজানু হইয়া প্রাণপূর্ণ ভক্তিতে রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। মাসিমাকেও।

রঙ্গলাল কোনো দিকে না চাহিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল : স-ন'টা হলো প্রায়। আর দেরি করো না বদ্যিনাথ। তোমাকে আরো কুড়িটে টাকা আমি একস্ট্রা দিচ্ছি। বেশ সাবধানে ওঠা-নামা করাবে, কুলির পেছনে ধাওয়া না করে এদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে। দেখো মা'র যেন কোনো অসুবিধে না হয়। ছুটি পেলে আমরাই একবার বেড়িয়ে আসবো তেওটিয়া। কী রে নলিনী, খাবারের ঝুড়ি আঁকড়ে বসে আছিস ? তোর কিন্তু একজনের

কোলে বসতে হবে, নইলে জায়গা হবে না। কী রে, তোর মামিমা এসেছে, দেখলি না ?

তাহার মামিমা ফিরিয়া আসিয়াছে সেটা তাহার কাছে বিশেষ নির্ভাবনার কথা নয়, কেননা সে তাহার বাক্স-দেরাজ সমস্ত ফাঁক করিয়া আসিয়াছে। তাই সে বিশেষ উতলা হইয়া কহিল : কিন্তু তোমার তা হলে আর বিয়ে হলো না, মেজমামা ?

রঙ্গলাল হাসিয়া বলিল : বিয়ে না হলে তোর মামিমাকে পেলাম কোথায় ? তোর স্বামীকে তুই কয়টা বিয়ে দেওয়াবি ?

এতোক্ষণে রাজলক্ষ্মী গলায় কথা পাইল। কঠিন অথচ করুণ কণ্ঠে সে কহিল : বৌকে এনে আমাকে তুই এমনি করে আজ তাড়িয়ে দিলি, রঙ্গ ?

রঙ্গলাল বিবর্ণ, বিমর্ষ হইয়া কহিল : ও-কথা মনেও এনো না, মা। তোমাকে তাড়াবো কী ? যখন খুশি তুমি আসবে, তোমার স্থান, তোমার রঙ্গলাল-পান্নালাল, তোমার আভা—তার থেকে কে তোমাকে বিচ্যুত করে ? ওঠ মাসিমা, আর সময় নেই। দাঁড়াও, প্রণাম করে নি।

মাসিমা রোয়াকে নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও আসিল। তাহার পায়ের তলায় মাথা নোয়াইয়া রঙ্গলাল ডাকিল : মা।

রাজলক্ষ্মী বলিল : আমি তোর কে ? আমি তোর কেউ নই। বলিতে-বলিতে তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া অজস্র অশ্রু নামিয়া আসিল : বৌই তোর সব। তোর মা'র চেয়েও বড়ো।

রঙ্গলাল ফের ব্যস্ত হইয়া উঠিল : তোমাকে একটু কষ্ট করেই বসতে হবে, বদ্যিনাথ। শীতকালে, ঘেঁষাঘেঁষিতে বিশেষ কষ্ট হবে না। এ তোমার কী ফ্যাশান, কোটের নিচে অর্ডিনারি একটা শার্ট। কী বেজায় শীত, খেয়াল আছে ? নাও, আমার এই র‍্যাপারটা নাও। নইলে মারা যাবে যে। লোজঙে যদি পারো, নেমে একটা টেলি করে দিয়ো। ভারি ব্যস্ত হয়ে থাকবো। তোমার সেই ওষুধটা নিয়েছ তো মা ? টাকার দরকার হলেই লিখবে। ছুটি পেলেই আমি আভাকে নিয়ে একবার তোমাদের ওখানে যাবো, মাসিমা। আভা এখনো পদ্মা দেখেনি। বাঙালী মেয়ে কখনো পদ্মা দেখেনি ভাবতে পারো ? পান্নাকেও নিয়ে যাবো, মা। দিল্লিতে খেলায় ও নাকি দুটো সেনচুরি করেছে। বিলেত যাওয়া ওর সার্টেন।

রঙ্গলালের সঙ্গে-সঙ্গে আভাও নিচে নামিয়া মোটর ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু সজল, মুখখানি বিষাদে অতি স্নিগ্ধ ও করুণ।

মাসিমা পাশে বসিয়াছিলেন। হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া হঠাৎ আভার মাথার উপরে রাখিলেন। স্নেহবিগলিত কণ্ঠে কহিলেন : যাবার আগে তোমাকে কী আর বলে যাবো, মা ? জন্ম-জন্ম স্বামী-সোহাগিনী হও।
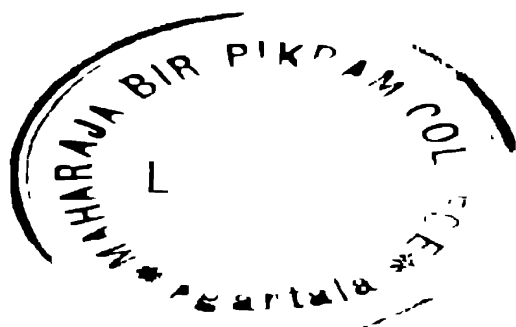
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের প্রথম দিক-চিহ্ন

অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'

অচিন্ত্যকুমার চিরকাল নতুন পথের প্রণেতা। সনাতনের ঘেরাটোপ ভেঙে বাংলা-সাহিত্যকে যাঁরা জীবনের প্রশস্ত পথে টেনে আনার বিপ্লবসাধন করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার ছিলেন তাঁদের অন্যতম অগ্রনায়ক। সেই সাহিত্য-বিপ্লবের প্রথম দিক-চিহ্ন 'বেদে'। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত: যেমন ছয়টি রস, তেমনি ছয়টি নায়িকা। কেউ অভিজাত মেয়ে, কেউ বা গরিব ঘরের ঘরণী, কেউ বা শহুরে, কেউ বা গেঁয়ো। কিন্তু প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন, প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বতন্ত্র রহস্যের অন্ধকার। ...অচিন্ত্যকুমারের এই প্রথম উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার প্রমাণ তাঁর দীর্ঘ চিঠি—যার প্রথম কথা: 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি।' বইয়ে চিঠিখানা পূর্ণ কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে। ছয়টি নায়িকার অভিনব আঙ্গিকে আঁকা ছবি। অভিনব গ্রন্থসজ্জা। দাম ৩.০

অচিন্ত্যকুমারের 'প্রথম প্রেম'

একটি যুবক, একটি যুবতী, আর এই ধূলিরুক্ষ পৃথিবী। তবু যৌবনের সমাগমে এমন একদিন আসে যেদিন পৃথিবীকে স্বর্গ বলে মনে হয়, দেহকে মনে হয় দেবতার আয়তন। সেই হচ্ছে প্রথম প্রেম। জীবনে প্রথম সূর্যস্নান। নারী তখন নারীর অধিক, পুরুষ তখন পুরুষের উপর। এ সেই

প্রেম যার শোক নেই, গ্লানি নেই, পিপাসা নেই। জীবনে নারী হয়তো আসে বহুবার, কিন্তু প্রেম আসে শুধু একবার, আর সে-প্রেম প্রথম প্রেম আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন একটি কাহিনী। শোভন প্রচ্ছদপট। দাম ৩৲

অচিন্ত্যকুমারের 'যতনবিবি'

অচিন্ত্যকুমার খুঁজে পেয়েছেন সত্যিকার দেশকে, সত্যিকার দেশবাসীকে। তাঁর এই সত্যদৃষ্টির প্রথম পরিচয় 'যতনবিবি'। পরিত্যক্ত, প্রতারিত ও নিগৃহীতদের কথা। ভিক্ষুকমেয়ে ও বাবুর্চি, কুমোরের চাক ও পানের বরজ, চালের লাইন ও ইস্কুলমাস্টার, সার্কাসের মেয়ে ও ক্লাউন···বহু বিচিত্র চরিত্র ও বহু বিস্তীর্ণ পরিবেশ। অভিনব দেখবার ভঙ্গি, অভিনব আবেদন। দশখানি চমৎকার ছবি। পরিপাটি গ্রন্থসজ্জা। দাম ২৷৷৹

অচিন্ত্যকুমারের 'নতুন তারা'

অবিরত-প্রবাহিত গল্প-উপন্যাসের মাঝে অচিন্ত্যকুমারের এই একাঙ্ক নাটিকাগুলি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সার্থক শিল্পসৃষ্টি। নাটকের যে-রস দ্রুত সংলাপে, উৎকণ্ঠা সৃজনে ও অভাবিত অথচ অবশ্যম্ভাবী বিস্ময়োৎপাদনে, সে-রসে প্রত্যেকটি নাটিকা গুণান্বিত। নাটিকাগুলি পড়ে নটসূর্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। স্বল্প সময়োপযোগী নাটকের অভাবে আমাদের বহু প্রীতি-অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকে, সেই অভাব এই নাটিকাগুলি দূর করল এতদিনে। মনোহারী গ্রন্থসজ্জা। দাম ২৷৷৹